শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনাঞ্জলি

ফণিভূষণ সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : শ্রীপূর্ণেন্দু রায়
মুদ্রণ : ব্লকম্যান প্রসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও আর. বি. মণ্ডল কর্তৃক ডি. বি. প্রিন্টার্স,
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত।

কল্যাণীয় মণীশ

কল্যাণীয়া বধুমাতা

ও

সুমনকে

স্নেহাশিসসহ উৎসর্গ করিলাম।

"সুখী হও দুখী হও তাহে ক্ষতি নাই
তোমরা তাঁরই হও আশীর্বাদ তাই।"

সূচীপত্র

স্নেহার্থীর প্রণাম

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গভীর ব্যঞ্জনাময় কথায় ভক্ত-হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সেই ভগবৎ-প্রেমে-সিঞ্চিত হৃদয়ে যে ভাবনাগুলি রহিয়া রহিয়া জাগিয়া উঠে সেগুলি স্বতঃই ভক্তের ইষ্টপাদপদ্মে নিবেদিত শিউলির মত শুভ্র ভক্তি-কুসুম। এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলি এইরূপই এক আবাল্য সারদা-রামকৃষ্ণে নিবেদিত-প্রাণ ভক্তের হৃদয়ে উত্থিত ভাবরাশির লেখনীমুখে রূপায়িত ভক্তি-অর্ঘ। শ্রীফণিভূষণ সান্যালের জন্ম এক পরম ভক্ত পরিবারে। পিতা ৺অনুকূলচন্দ্র সান্যাল ছিলেন শ্রীশ্রীসারদামাতাঠাকুরাণীর কৃপাধন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের তিনি ছিলেন সতীর্থ ও সুহৃদ্। মা-ঠাকুর ও স্বামীজির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির বীজ তাই একান্ত বাল্য বয়েসেই শ্রীফণিভূষণ সান্যাল মহাশয়ের জীবনে উপ্ত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সাধুগণের সস্নেহ আশীবাদ ও পুতঃসঙ্গের প্রভাবে এবং তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ফণিভূষণ মহাশয়ের সমগ্র জীবন ঠাকুর-মা-স্বামীজির প্রতি নিবেদিত এক ভক্তের জীবনে পরিণত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-পর্ষদ ভক্তবর মাস্টারমশায় তাঁর সদা রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের কথায় বলেছিলেন যে কয়েক কলস সমুদ্র-জল তিনি রেখেছেন নিজের কাছে এবং কেউ তাঁর কাছে এলে সেই জল দিয়েই তাঁকে পরিতৃপ্ত করেন। What else can I speak of but his words.'। শ্রীফণিভূষণ সান্যাল অধ্যাপনা বৃত্তি অবলম্বন করেই জীবনের এক বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন—অনেক সম্ভাবনাময় রঙীন জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে—এবং সেই সূত্রে তিনিও মাস্টারমশায়। তাঁর স্নেহভাজনদের অনেকের কাছেই তিনি 'স্যার'। যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যলাভ করেছেন তাঁরা জানেন এই মাস্টারমশায়ের মন-প্রাণও সদা রামকৃষ্ণময়। তাঁরও সকল প্রসঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু তাই ভগবান রামকৃষ্ণে গভীর ভক্তি। তাঁর ভাবনায়, চিন্তায় ওতপ্রোতঃভাবে পরিব্যাপ্ত এই ভক্তি। স্মরণ-মনন, সাধনাদির অবকাশে প্রায়শঃই তাঁর এই ভগবৎ-চিন্তা রূপ পেয়েছে। রচনাগুলির মাধ্যমে নিটোল ভক্তি ও বিশ্বাসের অঞ্জলিরূপ প্রকাশিত। অনুরাগীদের একান্ত আগ্রহে সেই রচনাগুলিকে একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বর্তমান প্রচেষ্টা যে ঠাকুরের কৃপায় সার্থক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রচনাগুলি ভক্তিমানদের হৃদয়ে আশা ও আনন্দের স্ফুরণই শুধু ঘটাতে সক্ষম হবে না, তাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিত্তিও

যে সুদৃঢ় করবে ইহা সুনিশ্চিত। ভক্তি-বিশ্বাসে টলটল ও অধ্যাত্ম চেতনায় প্রোজ্জ্বল এই রচনাগুলি মনে করিয়ে দেয় ফণীবাবুর কণ্ঠে বহুবার প্রতিধ্বনিত এবং তাঁরই নিকট শ্রুত এক মনীষীর সেই অপূর্ব বাণী--'Spread sunshine ! There is no mud on earth which can stand against the sun.' এই sunshine সংকলিত রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিময়। ভক্ত পাঠক উপলব্ধি করবেন যে মনের সংশয় রূপ mud এই ভগবৎ-বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল দ্যুতির প্রবাহে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

ওঁ নমঃ শ্রীভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো নমঃ।

ভূমিকা

রামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামীজী এক জায়গায় বলেছিলেন যে তাঁর শক্তির (বা তাঁর বিরাটত্বর) সম্পূর্ণ পরিমাপ এখনও হয়নি। মাত্র কিছুদিন আগেই এই উক্তিটি আমার চোখে পড়েছিল, কিন্তু ঠিক ভাষাটা আমার মনে নেই। সে যা-ই হোক—আমি দেখছি এখনও সেই মহান ঐশীশক্তির পূর্ণ মূল্যায়ন হয়নি। আজও হয়নি—দূর ভবিষ্যতে হবে কিনা সন্দেহ। কারণ, এখন দেখ'ছি যাঁরা সব লিখছেন বা বলছেন ঠাকুর সম্বন্ধে, বেশির ভাগই চর্বিতচর্বন করছেন। ঐ বিরাট মানুষটিকে বুঝতে, তাঁর সীমাহীনত্ব অনুভব করতে হলে আরও কয়েকটি বিবেকানন্দর দেহ ধারণ প্রয়োজন।

ফণিভূষণ সান্যাল মশাই বিদগ্ধ ব্যক্তি, উচ্চ-শিক্ষিত, খ্যাতনামা অধ্যাপক—তিনি গেলেন রামকৃষ্ণ-সাগরের সীমা খুঁজতে, ফল যা হয়,—নুনের পুতুলের অবস্থা—গলে রামকৃষ্ণ মাধুর্যসাগরে ডুবে গেলেন। আর কিছু রইল না তাঁর জীবনে--ঐ মাধুর্য ছাড়া। বর্তমান পুস্তকটি সেই মাধুর্যেরই অমৃত-কণা, কিছু কিছু অমৃতময়। আমি প্রথম ওঁর হাতেই ইংরেজী বইটি দেখি হরিদ্বারে—Gospels of Sri Ramkrishna, ওঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়ি। সেকথা আজও মনে আছে এই জন্যে যে—তখনই মনে হয়েছিল বাংলায় এই রকম নিত্যসঙ্গী একটি বই বেরোলে ভাল হয়। হয়ত বেরিয়েছে—তবে আমার চোখে পড়েনি। ফণীবাবুর বইটিও সর্বদা কাছে রাখার মতো। এর বৈশিষ্ট্য এই যে ঐ 'গসপেল'-এর মতো শুধুই ঠাকুরের বাণী নয়—এর মধ্যে ফণীবাবুর নিজস্ব অনুভূতিও আছে, আর সে অনুভূতির প্রকাশ—যে লোকটি অমৃতের মধ্যে ডুবে আছেন তিনি সেই অমৃতস্বাদ ছাড়া আর কি দিতে পারেন আমাদের! শুধু ঠাকুর নয়—আমাদের সকলের আরাধ্যা জননী ও স্বামীজী—এঁদের বাণীও আছে—কিন্তু সেও কি ঠাকুরেরই বাণী নয়? ওঁদের কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল? ওঁরাও তো ঐ সমুদ্রে ডুবেছেন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ডুব দে রে মন
রামকৃষ্ণ নামে

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনাঞ্জলি—১

"এসেছে এক নূতন মানুষ, দেখবি যদি আয় চলে"

যাহারা আসিল তাহারা দেখিল : এক নূতন মানুষ, সর্বদা ঈশ্বরভাবে বিভোর, ঈশ্বরকথায় মত্ত, কামকাঞ্চন-সম্পর্ক-শূন্য। তাহারা শুনিল, নূতন মানুষের নূতন কথা 'হাঁ, ঈশ্বরকে দেখা যায়।' 'সকল ধর্মই সত্য। সকল মত, সকল পথ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়।' সকল পথের সাধক এই নূতন মানুষটিকে তাহাদের অতি আপন মনে করিয়া ভালবাসে।

'একং সৎ, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি', এ কথা পুরাতন। কিন্তু সেই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং প্রয়োজন অনু-যায়ী অন্যকেও তাহার মনের মত 'ঘরে'—তাহার ইষ্টলোকে লইয়া যাইতে পারেন,—এরূপ মানুষ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন মানুষ। তিনি পুরাতন সত্যের নবতম বিকাশ,—বহুধা অনুভূত সত্যের সমন্বিত মূর্তি, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ 'পুরুষঃ পুরাণঃ'। তিনিই আবার নূতন মানুষ—চিরপুরাতন হইয়াও নিত্য নূতন—আগামী কালের সর্বাঙ্গীণ অভ্যুত্থানের জীবন্ত প্রতীক : ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ার নূতন চন্দ্রকলা বহিয়া আনে নবজীবনের আমন্ত্রণ, পরিপূর্ণতার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা।

করুণাসিন্ধু

তখনকার সর্বজন-ঘৃণ্য এই রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন, এবং সেই স্তূপীকৃত ঘৃণার মধ্যে থেকে অভিনেত্রীদের 'মা আনন্দময়ীরূপে' দর্শন করে চৈতন্য লাভের আশীর্বাদ করেছিলেন একজনই—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

দিব্যজ্যোতি পরম আশ্চর্য মহামানবের মুখে এই করুণামাখা 'মা' যাকে, তাদের আলোড়িত সত্তার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল কোন পরমা-জননী—তা' কি আমাদের পক্ষে কল্পনায় আনা সম্ভব?

কল্পনা করি—তিক্ত বিদ্রূপ নিয়ে, তীব্র লালসা নিয়ে, অফুরন্ত ঘৃণা নিয়ে, শুচিতার অহংকার নিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দণ্ডধারী সমাজ, —আর সামনে রয়েছেন, স্নিগ্ধকরুণা নিয়ে, অকৃত্রিম দাক্ষিণ্য নিয়ে, নির্ভয় আশ্রয় নিয়ে, শুচিসুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি সর্বস্তরের নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর আরাধ্য দেবীকে। রঙ্গশালায় নারীমর্যাদার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই অভিনেত্রী সম্প্রদায় আকুল হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য, প্রণাম নিবেদন করে ধন্য হয়।

মহত্তম শিল্প

ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ। ভাবজগতে মুহুর্মুহু তাঁর রূপ-অরূপের লীলা। তিনি একাধারে শিল্প ও শিল্পী; নানা ভাবে নানা রূপে—সমাধিতে, নৃত্যগীতে, অমৃত আলাপনে তিনি তুরীয়লোকের আনন্দলীলা বিশ্বজনের নয়নগোচর করেছেন। তাঁর দিব্য জীবনবীণাধ্বনি নিখিলের অনুরাগীবৃন্দের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হয়ে, বিশ্বচরাচরে এক মহাসঙ্গীতের ঝঙ্কার তুলে চলেছে।

মানবমনের বহু বিচিত্র ভাবের প্রতিটি সূক্ষ্ম কম্পন অনুধাবন করে তাকে অনন্তের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া,—সারাজীবন তিনি এই শিল্পব্রতে নিয়োজিত থেকে মানবসভ্যতার এক সর্বজনীন মহামন্দিরে পরিণত। যে মন্দির সকল ভাবের, সকল যুগের, সকল মানুষের কাছে অবারিত দ্বার।

তাঁর ভাবসমুজ্জ্বল যে মূর্তিখানি আজ ঘরে ঘরে পূজা পাচ্ছে, আধুনিক কালের ইতিহাসে তাই মহত্তম জীবনশিল্প।

কথামৃত দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ

'কথামৃতের' প্রবল আকর্ষণ, শ্রীরামকৃষ্ণ,—'সম্মোহক রামকৃষ্ণ' এখানে সরাসরি উপস্থিত বলে। সেই 'ত্যাগীশ্বর' অথচ 'চিরউন্মাদ প্রেমপাথার'

দেবমানবকে বিরল প্রতিভার সঙ্গে উন্মোচিত করতে পেরেছেন 'শ্রীম'। কথামৃত পড়লেই মনে হবে, কিছুই হারিয়ে যায়নি—এই তো তিনি রয়েছেন, কথা বলছেন,—আছেন, আছেন সামনেই দাঁড়িয়ে। নিত্য-ভগবৎ-সান্নিধ্যের এই সুযোগ দেয় বলেই 'কথামৃত' ভক্তের কাছে দুর্লভ চিন্তামণি, আর মণিকথার নির্ঝর তো বটেই। মাষ্টারমশায়ের বিবরণ : "ভক্তেরা বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ন; যে যত পারে কুড়াইতেছে।…সৃষ্টি হইতে এ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্যার উদয় হইয়াছে, সব সমস্যার পূরণ হইতেছে।…শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নয়,—ঈশ্বরপ্রেম : 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।' এই আশ্চর্য মানবপ্রকাশকে বিস্ময়মুগ্ধ নয়নে দেখি কথামৃতের দর্পণে।

কথামৃতে ক্ষণে ক্ষণে বিকীরিত শ্রীরামকৃষ্ণ—হাস্য-পরিহাসে, গভীরতায়-গহনতায়, অবস্থানে, প্রস্থানে-প্রত্যাবর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ : ধন্য গ্রন্থ !

ঠাকুরকে দু'চোখ ভরে দেখার সৌভাগ্য

মা ভক্ত সন্তানকে বলেছেন : 'ধ্যান না করতে পার, ঠাকুরের দিকে শুধু চেয়ে থাকলেই হবে।'

আন্তর-জীবনের কত লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্রের পর ভগবানের দিকে এই চেয়ে থাকাটুকু পাওয়া গেছে—তার ইতিহাস কে জানতে পারে? ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে পড়া অসহায়কে কৃপাঘূর্ণি হয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসেন যুক্তিহীন অছিলায়, ধরে এনে বসিয়ে রেখে, এই যে 'চেয়ে থাকা'টুকু করিয়ে নেন—এতেই বুঝি হারানো ছেলেকে ফিরে পাওয়ার কী আকুলতা তাঁর।

"এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,—

এ দয়া যে পেয়েছে, তার
লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাই।"

'চেয়ে থাকা'

মা বলেছেন, 'ধ্যান করতে না পার ঠাকুরের দিকে শুধু চেয়ে থাকলেই হবে।'

ভক্তের ভগবানের দিকে চেয়ে থাকাটুকু এমন এক অলিখিত মহাকাব্য যা পড়ে শেষ করা যায় না। আন্তর-জীবনের কত লঙ্কাকাণ্ড, কত কুরুক্ষেত্রের পর যে এই 'চেয়ে থাকাটুকু' পাওয়া গেছে তার ইতিহাস কে জানবে।

ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে পড়া অসহায়কে কৃপাঘূর্ণি হয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসেন যুক্তিহীন অছিলায়,—ধরে এনে বসিয়ে রেখে এই চেয়ে থাকাটুকু করিয়ে নেন, এতেই বুঝি হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়ার কী তীব্র আকুলতা তাঁর।

ঐ করে বেড়াচ্ছেন—অবহেলিত বাগানে লুকানো ফোয়ারার মুখ খুলে দেওয়া। তাঁর ভালবাসার দায়, তাই 'বেঠিক' লোকদের ভিতর থেকেই ঠিক ঠিক লোকদের তৈরী করে দেওয়াতেই তাঁর আনন্দ।

"বড় শূন্য, বড় একা, বল, বল মোরে
আছ মোর পিতা তুমি, হাতখানি ধরে
তোমার হাতের মাঝে।"

হে রামকৃষ্ণ, তুমি আমার সব চাওয়ার চরম প্রাপ্তি, তুমি আমার সব প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা, সব সমস্যার সুনিশ্চিত সমাধান।

ভাস্বর ভাবসাগর চিরউন্মদ প্রেমপাথারের পটভূমিকায় ঠাকুরের শ্রীমূর্তি পরিশোভমান।

ঐ মূর্তির চরণকমলে আমার হৃদয় চিরবিক্রীত, দুস্পার সংসার-সমুদ্র পার হওয়ার জন্য আর কোন চিন্তা নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের দান

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সম্পূর্ণ নূতন একটা জিনিসের স্বাদ মানুষ পেল, এবং তাতেই সকলে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হ'ল। নিঃস্বার্থ অথচ প্রাণ-ঢালা ভালবাসা কি,—এইটি তিনি মানুষকে দেখালেন।

ভালবাসা—অকপট প্রেম কী জীবন্ত শক্তি ও প্রত্যক্ষ বস্তু, তাঁর অন্ত্যলীলার ক্ষণগুলিতে, সেই মহানাট্যের শেষ অঙ্কে কাশীপুরে সকলেই বেশ অনুভব করল, যা বিশেষ করে চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ সেটাই তো রামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তি। এই অকপট ভালবাসাই রামকৃষ্ণ-সারদার সন্তানেরা জগতে প্রকাশ করে, স্বার্থের দুনিয়াতে প্রেমের দুনিয়ার ছোট একটু ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

আর একটি একেবারে নূতন কথা ঠাকুর আমাদের শোনালেন,—'ঈশ্বরলাভ মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।' জগতে একটা নূতন তরঙ্গ, নূতন ভাবস্রোত উঠল। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, ঘর-সংসার—সব ভুলে ভগবানের চরণে সমস্ত জীবনটা ঢেলে দেওয়ার জন্য, গৃহী ও সন্ন্যাসী নির্বিশেষে কিছু মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—একটা নূতন জগৎ, নূতন জীবন, নূতন উদ্দেশ্যের আলোর দুর্নিবার আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে চলেছে। 'জয় শ্রীসারদা' 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ'।

পুণ্য শিবরাত্রিতে সদা শিব-রামকৃষ্ণ

শিব জ্ঞানঘন চৈতন্যস্বরূপ, বিশুদ্ধ বোধময়—সর্বোপাধিহীন নির্বিকার পরম সত্তা। তাই শিবরাত্রি 'চির-উন্মদ প্রেমপাথার' রামকৃষ্ণ-মহাসাগরের স্থির নিঃসীম মহামৌন রূপটি আমাদের দৃষ্টিসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে এক নৈর্ব্যক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন। শ্রীশ্রীমা ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, 'ঠাকুর আমার পিতা, মাতা, স্বামী,—সব।' এই 'সব' ইষ্টের নৈর্ব্যক্তিক লক্ষণা—সীমা যখন অসীমে হারাইয়া যায়, তখনই 'সবের' উপলব্ধি হয়। আরতি স্তোত্রের ভাষায় ঠাকুর 'নির্গুণ গুণময়'। যেসব অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তাঁহার চরিত্রকে বিভূষিত করিয়াছিল, তাহার কথা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ 'গুণময়'। কিন্তু তাঁহার গভীরতর অনুধ্যানে ঐ সকল চিন্তাকে ছাড়াইয়া আমাদের মন যখন একটা অব্যক্ত অসীম সত্তায় স্থিতিলাভ করিতে উন্মুখ হয়, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ রহিয়াছেন তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া। রামকৃষ্ণরূপ সচ্চিদানন্দ মহাসাগরের কি পার আছে ? নির্বিকল্প সমাধি ঐ সিন্ধুর একটি দিক। প্রেমে হাসা-নাচা-কাঁদা তাহারই অপর একটি প্রতিচ্ছবি। ঠাকুর বলতেন, 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।' 'জ্ঞান ও প্রেম' একই অনুভূতির দুইটি দিক মাত্র। এই জ্ঞান-ভক্তির সমন্বিত উপলব্ধিতে—চিদাকাশে, যুগপৎ সূর্য ও চন্দ্রের উদয়েই, রামকৃষ্ণ উপলব্ধির পরিপূর্ণতা।

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশো সি মহেশ্বর।
যাদৃশো সি মহাদেব, তাদৃশায় নমো নমঃ॥"

* *

"পার্বতী পরমেশ্বরৌবন্দে
শ্রদ্ধা-বিশ্বাসরূপিনৌ।"

* *

জয় মা : জয় ঠাকুর

রামকৃষ্ণ—আবির্ভাব অনুচিন্তন

"তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ-অবতারগণের জমাট বাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা' জীবনপাতী তপস্যা করেও এক চুল বুঝতে পারলাম না। তাই তাঁর কথা একটু সংযত হয়ে বলতে হয়।" (স্বামীজী)

'প্রভুকে অবলম্বন কর, তাঁহাকেই ধরিয়া থাক। তাঁহাকেই আপনার কর, তাঁহাকে ভুলিও না। তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে কোন ভয় নাই।'

(হরি মহারাজ)

"ঠাকুর যখন আমাদের টানেন, আমাদের অলক্ষ্যে, চুপিসাড়ে আমাদের হৃদয়ে আসেন, তখন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা—'পরমা যন্ত্রণা' দেখা দেয়,—বেদনাদায়ক এক মহা অস্বস্তি। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয়েছে যে, জীবনে এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তাতে আমার কোনমতেই চলবে না, এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা' আমি কিছুতেই পাচ্ছি না। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই ; "ও মোর ঘুম-ভাঙ্গানিয়া ; ও মোর দুঃখ-জাগানিয়া ; ও মোর দরদিয়া !"

'দাঁতের ব্যামোর' মত নিরুচ্ছেদ টন্‌টনে একটা ব্যথা,—নিদ্রাহীন নিরঙ্কুশ ব্যথা হয়ে তুমি আমার অন্তরে নিয়ত জাগ্রত থেকে আমার মোহনিদ্রা ঘুচিয়ে দাও,—তোমার পুণ্য আবির্ভাবের আলো আমার মনের চোখে পড়ে তার মিথ্যা সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে দিক ; সঙ্গে মনে ভরসা জাগুক,—

"এই আঁধারে
আমি পাবই পাব 'তারে',
যে জন আমার
চিরদিনের সাথী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ ও আহ্বান

চরম ভোগপরায়ণতার এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বিপুল আকর্ষণ সর্বস্তরের মানুষ বোধ করছে, তা' থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা আপাততঃ সাংসারিক ভোগসুখের দিকে যতই ছুটি না কেন, তাতে আমাদের সত্যকার তৃপ্তি হয় না। আমার অন্তরের গভীরে সংসার-সুখের অতীত 'কিছুর' জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। ঠাকুর আমাদের এই আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দেন, এবং তা' পূরণের সম্ভাবনাও আমাদের

সামনে উজ্জ্বল করে দেন বলেই এত এত লোক ব্যাকুল হয়ে তাঁর চরণ-প্রান্তে আসছে।

"মূল্যহীনেরে সোনা করিবার,
পরশ পাথর হাতে আছে তার।"

তাঁর নামগঙ্গা অবিরলধারে অগণিত ব্যথিত, তাপিত, অশান্ত মানুষের হৃদয়-মরুভূমি স্নিগ্ধ শীতল করে তাতে কেমন একটা কোমল সৌন্দর্য ও সুষমার সঞ্চার করছে, এইভাবে ঠাকুরের পরিবার বেড়েই চলেছে।

সংসার-অগ্নিকুণ্ডের পারে যে আনন্দ-গঙ্গা নিত্য প্রবাহিত, তাঁর আশ্রিতজনকে ঠাকুর মায়ের স্নেহে হাত ধরে সেখানে নিয়ে যাবেন বলে আকুলভাবে সকলকে ডাকছেন—'তোরা আয়, এই আনন্দ উপভোগ কর।'

অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জন্য তিনি অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছেন। 'রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে, বাড়া ভাতে বসে যা'—বলে সকলকে ডাকছেন। মানুষ ছুটে আসছে, ভরপুর হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি, অবাক হচ্ছি, আর ভাবছি—

"কালে না জানি আরও কত হবে"

বছরের চির-আকাঙ্ক্ষিত দিনটিতে আকুল হয়ে বলতে চাই—

"যা দিয়েছ এবার এ প্রাণ ভরি,
খেদ রবে না এখন যদি মরি।"

তুমি আমার 'আপন' মনে হলে যে ভাববিহ্বল চোখে জল এসে যায়।

ভাবসমুজ্জ্বল প্রেমসিন্ধু

কামারপুকুরের সেই আত্মভোলা অপরূপ বালক আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন, বহুজনের দুঃখের ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন। সদাই তাকিয়ে আছেন—কখন তাপিত, ব্যথিত, হতাশ বিভ্রান্ত দুঃখীজনেরা আসবে। 'নিষ্কারণ ভক্তশরণ'—বিনা শর্তের কাণ্ডারী। ধরাছোঁয়ার বাইরে যিনি,

তিনি কৃপা করে ধরা দিয়েছেন। ব্যক্ত হয়ে, ব্যস্ত হয়ে, প্রাণের বস্তু হয়ে হৃদয়ে এসেছেন, যাতে তাঁকে আঁকড়ে ধরে এই সংসারের সমস্ত অশান্তি, আবিলতা স্পর্শ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পঙ্কিল এই কলিকালে তিনি হচ্ছেন—'মোচন অঘদূষণ'। 'ঐ বিমল নয়নই তো জ্ঞানাঞ্জন'—মায়া-মোহনাশী ভাস্বর জ্যোতি।

দেখতে আমাদেরই মত, আপনজন, একেবারে ঘরের মানুষ—অথচ পূর্ণ পরব্রহ্ম। কিন্তু এ পণ্ডিত দার্শনিকের নির্বিকার ব্রহ্মসাগর নয়, এ 'চিরউন্মদ প্রেমপাথার'—যাঁর প্রেমের অন্ত নেই, তাঁর প্রেমের হেতুর কি প্রয়োজন ?

তাঁর চিদঘনকায় দেবতনু জ্বলজ্বল করছে কোটি ভক্তহৃদয়ে, এই ব্যাকুল আর্তি যে হৃদয়ে নিত্য অনুরণিত হচ্ছে—

"সম্পদ তব শ্রীপদ।
ভব গোষ্পদ বারি যথায় ॥
ত্যাগীশ্বর হে নরবর ঃ
দেহ পদে অনুরাগ ॥"

ভোলানাথ রামকৃষ্ণ

শিবরাত্রির পুণ্যতিথিতে রামকৃষ্ণ-সন্তান তার হৃদয়সর্বস্ব ঠাকুরকে বিশেষভাবে স্মরণ-মনন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আমার ঠাকুরই তো শিব-ভাবের—পেছিয়ে পড়া মানুষদের, সংসারে লাঞ্ছিত-উপেক্ষিত, বুদ্ধিহীন অযোগ অবোধ মানুষের, বিশৃংখল ছন্নছাড়া যাদের জীবন, যারা উৎপেতে বলে সকলের বিরক্ত সৃষ্টি করে, সকলে যাদের 'দূর ছাই' করে, সেই খাপ-ছাড়া মানুষদের প্রতি **intense sympathy**, অগাধ ভালবাসার মূর্ত-রূপ। আর কি বিশ্ববিমোহনই না সে রূপটি—'রজতগিরিনিভং বরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্ মহেশম্'—বলে মন যাঁর পায় লুটিয়ে পড়ে। কামারপুকুরে 'যুগীদের শিবমন্দিরটি' জ্যোতির ধারায় পূর্ণ হয়ে উঠে প্রবাহকারে এসে মাতা চন্দ্রামণির উদরে প্রবেশ করছে, চন্দ্রামণির এই দর্শনেই ঠাকুরের শিব-

:স্বরূপটি কি স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয় নি ? ঠাকুরের করুণাঘন ভোলানাথ শিবরূপটিই আমাদের নিত্যধ্যানের বিষয় হোক। সে রূপটি যে বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর, বড় ভরসা-সঞ্চারী :

"প্রণমামি রামকৃষ্ণ—শিবম্ শিবকল্পতরুম্" :

"রামকৃষ্ণ বল,
রামকৃষ্ণ বল আমার মন।
রামকৃষ্ণ আমার ভুবনচন্দ্র,
আলো করেছেন ভুবন॥"

করুণাময়ী মা

'আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন ?'

ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেন, 'জান তো বাবা, ঠাকুরের ছিল, জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে রেখে গেছেন।'

কথাটা বিশেষ তাৎপর্যের, সন্দেহ কি? দেহাত্মবাদী, ভোগলোলুপ মানবসমাজকে উচ্চতর অনুভূতিরাজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভগবতীর এই যুগে এহেন অনুপম মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। এই অপূর্ব চেতন বিগ্রহ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে অগণিত ভক্তসন্তান আজ ধন্য ও কৃতার্থ।

ভক্ত চায় তার ইষ্ট,—তার সমস্ত দুর্বলতা, সর্বপ্রকার অক্ষমতা ভুলে পরিপূর্ণ স্নেহে তাকে কোলে টেনে নেবেন। ইষ্টদেবীর মুখে এই বিচার-শূন্য স্নেহপূর্ণ হাসি দেখে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে চায়। মানুষের বহুযুগের এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ পরিতৃপ্ত হয়েছে, মহাশক্তির বাস্তব মাতৃরূপ দর্শনে তার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে। সদাপ্রসন্না স্নেহময়ী 'মা' নির্বিশেষে সকল সন্তানের হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত করে তার দুঃখময় অতীত ভুলিয়ে দেন এবং প্রবল আকর্ষণে এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্ততাময় আনন্দসাগরের দিকে তাকে টেনে নেন। আর নেই এখানে স্বার্থলেশ, অথবা অর্থহীন উচ্ছ্বাস। এ প্রসাদময়ী ও সংযমের প্রতিমূর্তি মায়ের তুলনা নেই। মাতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে বসে ভক্তসন্তান অনায়াসে সংসারকান্তার অতিক্রম করতে পেরে ভয়ভাবনা মুক্ত, নিশ্চিন্ত।

"মাকে দেখব বলে
ভাবনা করা চলবে না আর!
সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়,
মা সবাকার।"

মাধুর্যময়ী মা

সর্বলোক-জননী সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাবৃত্তি মাত্র নন। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অনির্বচনীয়, অচিন্ত্যনীয় সত্তাকে মধুরতম কোমলরূপে বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করতে—তাঁকে প্রত্যেকের ঘরে নিজস্ব প্রাণের নিধিরূপে স্থাপিত করতে। সেই জন্য শ্রীশ্রীমা,—'ভক্তি', শ্রীরামকৃষ্ণ,—'জ্ঞান'।

একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ 'সত্য'—শ্রীশ্রীমা 'সুন্দর'। সুন্দরের আবেদন সর্বজনীন, তা অতি সহজে—অতি মধুরভাবে সকলের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে স্থায়ী আসন লাভ করে।

শ্রীশ্রীমা বিরাজ করছেন ঠাকুরের সমস্ত ভাবৈশ্বর্যকে মাধুর্যরূপে প্রকাশ করে। তাই ঠাকুর যদি হন 'সৎ'—মা 'আনন্দ'। 'সৎ' জ্ঞানের বিষয়। 'আনন্দ' প্রাণের জিনিস।

মা জ্ঞান ও প্রেমকে, সত্য ও শিবকে সমন্বিত করে উদ্ভাসিতা হলেন এক অপরূপ ভক্তিনম্রা, ভাবঘনা আনন্দময়ী মূর্তিতে—শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার আরম্ভ ও শেষ, মূল ও লক্ষ্য, শক্তি ও প্রেরণা, ঋদ্ধি ও সিদ্ধি রূপে।

"তব ধ্যান পরম উৎসব,
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব, দুষ্ট ষড়রিপু পরাভব।
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা, তব নাম জপমালা
অহংকার দমিত দানব,
অর্চনার অধিকার—অতুল বৈভব।"

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

অন্নপূর্ণা রূপে মা

কাল অন্নপূর্ণা পূজা, তাই মায়ের অন্নপূর্ণা রূপটি হৃদয়মনকে আনন্দে

উদ্ভাসিত করে তুলছে, আর অন্তর ঝংকৃত হচ্ছে সুবিখ্যাত 'অন্নপূর্ণা স্তোত্রে'র আকুল বন্দনাছন্দে।

"অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে, শংকর প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতী॥"

সেই ছবিও মনে জাগছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষে অনাহারক্লিষ্ট মানুষ জয়রামবাটীর রামচন্দ্র কুটিরের আঙিনায় দুধারে বসে পড়েছে, শ্যামাসুন্দরী তাদের পাতে গরম খিচুড়ি ঢেলে দিচ্ছেন, আর ছোট অন্নপূর্ণা মা হয়ে এসে শিশু সারদা পাখার বাতাস করছেন খিচুড়িতে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বুভুক্ষু মানুষদের খাওয়াচ্ছেন যাতে শুধু খিচুড়ি জুড়োচ্ছে না—প্রাণ জুড়োচ্ছে, শুধু পেট ভরছে না—হৃদয়ও ভরছে।

যে তাঁর কাছে আসে, অন্নপূর্ণা তাকেই ভরিয়ে দেন যে। তিনি অন্নদায়িনী, এবং সে অন্ন তো শুধু পেটের ক্ষুধার স্থূল অন্ন নয়। আজ মানুষ আসলে স্নেহবুভুক্ষু, অথচ এই স্নেহের অনন্ত ভাণ্ডার নিয়ে তিনি আমাদের জন্য বসে রয়েছেন। সে পরমায়ের প্রসাদ পঞ্চকোষকে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ—সর্ব কোষেরই এ পুষ্টিসাধনই শুধু করে না, কোষমুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উদ্ঘাটন করে চির প্রশান্তিতে, নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত করে। মা যে স্তোত্রের ভাষায় 'নিত্যানন্দময়ী, বরাভয়করী, মোক্ষদ্বারপাটনকারী'। তাই তো সন্তান সারদারূপী অন্নপূর্ণাকে পেয়ে তাঁর চরণে প্রাণের আবেগে প্রার্থনা জানাচ্ছে—

"প্রসীদ মাতঃ বিনয়েন যাচে,
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধ চিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্।"

ভালবাসায় ভরা মা

মায়ের কথাই আজ ভোরের ভাবনাকে ভরিয়ে তুলছে, বিশেষ করে

মাতৃলীলার ছোট একটি ছবি যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'দীপশিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু দীপশিখার মতই সম্পূর্ণ।'

জয়রামবাটীর মাতৃকুটিরের গোয়ালে শেষরাত্রে দড়িবাঁধা বাছুর মাতৃদুগ্ধের জন্য 'হাম্বা, হাম্বা' করে কাতরভাবে ডাকছে শুনেই মা—'যাই মা, যাই। আমি এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুনি তোকে ছেড়ে দেব।' এই বলতে বলতে ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে গোয়ালে ঢুকে গোবৎসের বন্ধন মুক্ত করে দিলেন।

একটু ভেবে দেখলেই এই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনাটির অসামান্যতা সংবেদনশীল মনে প্রতিভাত হবে। আর গোবৎসের চিৎকারে 'যাই মা, যাই' বলে মায়ের মাতৃহৃদয়-বিগলিত করুণামাখা সাড়ার কথা তো আমরা বইয়ে পড়ছি মাত্র, ভাগ্যবান ভক্ত সুরেনবাবু (সুরেন্দ্রনাথ সরকার)—যিনি তা স্বকর্ণে শুনেছিলেন এবং সেই কথার অক্ষরে অক্ষরে ক্ষরিত করুণারসে নিজ হৃদয় নিষিক্ত করেছিলেন এবং জগ-মাতার সর্বভূতে করুণাময়ী মূর্তি—বিশাল সর্বপ্লাবী মাতৃপ্রেমের উদ্বেগ সিন্ধু সন্দর্শন করেছিলেন। সাধে কী 'মাতৃলীলা সংকীর্তনে' মারাঠীভক্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলছেন—

"তির্যগু মাতঃ, পতঙ্গ মাতঃ।
সর্বাবিশেষ জনগণমাতঃ॥"

অনবদ্য, অপূর্ব এই সর্ববিজয়িনী মাতৃত্বশক্তি আমাদের নিত্যধ্যানের বস্তু হোক।

'মায়ের এ ভাব ভারিয়ে, কমলাকান্ত সহজে পাগল হল রে।'

এই জটিল যুগের সরল পথপ্রদর্শিকা—শ্রীশ্রীমা।

'জয় মা, জয় মা'।

সন্তাপহারিণী মা

মায়ের ছেলে কি কখনও পাপী হয়, দুঃখী হয়? অকারণ, অফুরন্ত ভালবাসারই তো অপর নাম 'মা'।

মায়ের মমতা-দ্রব বিশাল চোখ দুটিতে কী অগাধ শ্যামস্নেহ, যা সমস্ত রুক্ষতা, শুষ্কতাকে স্নিগ্ধস্পর্শে স্নিগ্ধকোমল করে তোলে। কী যেন একটা পাওয়া যায় শক্ত করে এঁটে ধরবার মত।

মায়ের সেই টানের কাছে কোন যুক্তিই টেঁকে না। আর মা কেন তার সন্তানকে ছাঁকে, তার কৈফিয়ৎ দেবে কে?

মা কাছে রয়েছেন জানলেই শিশু নির্ভয়, নিশ্চিন্ত। মহাজ্ঞানী শংকরাচার্যও তো মায়ের অবোধ শিশু হয়ে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত মাতৃস্তোত্রে বলছেন,—'জ্ঞানে মাতঃ। অবন্নুসরণম্ ক্লেশহরণম্।'—মা, আর কিছু জানি না, শুধু এইটুকু জানি যে তোমার কাছটিতে এলেই যত দুঃখ-কষ্ট মুহূর্তে সরে গিয়ে ভারী একটা খুশিতে মনটা ভরে যায়।

মাতৃনামের ময়ূরপঙ্খী

স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত মাতৃজীবন মহাকাব্য "শ্রীমা সারদাদেবী" গ্রন্থটি পাঠের পূর্বে মনে রাখতে হবে, আমরা পুণ্যতীর্থপরিক্রমায় চলেছি, —গঙ্গোত্রী-গোমুখীর গঙ্গার উৎস থেকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্যন্ত মাতৃকরুণা গঙ্গার ঘাটে ঘাটে আমাদের নিয়ে যাবে এই গ্রন্থের ময়ূরপঙ্খী তরণীটি, এবং একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে 'অপরূপার' বিভিন্ন রূপমাধুরী দেখে আমরা ভক্তিমুগ্ধ চিত্তে অন্তরে আরতির প্রদীপ জ্বালিয়ে আনন্দ-আরতি করতে করতে চলব, মাতৃনামের মহামন্ত্র অনুক্ষণ স্মরণে রেখে। আরতি-অন্তে মাতৃগঙ্গার প্রতিঘাটের তীর্থসলিলে স্নান করে জীবনকে সর্বকলুষমুক্ত ও প্রাণকে স্নিগ্ধ করব এবং এই বিভিন্ন মাতৃতীর্থের তীর্থসলিল হৃদয়ে ছোট ছোট স্বর্ণঘটে সঞ্চয় করে রাখব স্মরণ-মননের অক্ষয় সম্পদরূপে। মাতৃ অনুরাগ ভক্তির আলো যার চোখদুটিতে ফোটেনি সে 'অন্ধ'—এই অনন্ত বিরাট চিত্র, মাতৃলীলার এই মহাচিত্রটি শুধু হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে এর সৌন্দর্য কি করে আর উপলব্ধি করবে? আমাদের প্রার্থনা মায়ের চরণে—

"দিব্যাঞ্জন পরায়ে দাও,
দিব্যচক্ষে দেখি গো তোমায়।"

ভক্তি ও ভক্ত

অমলা ভক্তি

নীচে নেমে আসছি, আর গানের সেই কলিটি মনে যেন গুন্‌গুন্‌ করছি—

"এ যে সুখের নদী নিরবধি,
ধীরে ধীরে বাওরে।"

'মৃণাল কুটিরের' এই ঠাকুরঘরটি সত্যি স্বর্গ, গিয়ে বসলেই 'I am a child of God'—আমি ঠাকুর-মায়ের শিশু, কী স্নেহভরা দৃষ্টিতে চার চোখে তাঁরা আমায় দেখছেন বোধ হয়—না, এক এক দিন স্পষ্ট উপলব্ধির মতই যেন হয়ে ওঠে। কী যে ভাল লাগে, আর বহুক্ষণ ধরে এ ভাল লাগার রেশটা থাকে।

জগৎ ও জীবনের আসল সত্তা তো এই শিব-শক্তিরূপী ঠাকুর-মা। হৃদয়-মন-প্রাণ তাঁদের চরণে নিবিষ্ট করে জীবনটা ভগবৎময় করতে হবে—এই তো কথা। তাহলেই নিরবচ্ছিন্ন অফুরন্ত আনন্দের একটানা স্রোতে আমার তরীখানি ভাসতে থাকবে।

গীতায় ভগবান ভক্তের পরিচয় দিয়েছেন একটি মাত্র কথায়,—'মৎপরমঃ'—'আমি'ই তার 'পরম'—ভালবাসার আসল বস্তু।

আর 'আমার' প্রতি সমগ্র প্রাণের ভালবাসা যার, বাইরের সব আসক্তি তার তো খসে পড়বেই। তাই আবার জানাচ্ছেন, 'মদ্ভক্ত সঙ্গবর্জিত'—ভক্ত অনাসক্ত নিরুদ্বেগ, কারণ সে 'মৎপরমঃ'—এইটেই সার কথা।

সব ছেড়ে দিলে কি থাকবে? ঠাকুর যাকে বলতেন 'নিষ্কাম অমলা অহেতুক ভক্তি'। 'ত্বমেব সর্বং মম দেবদেবঃ।'

তাঁকে ভালবাসি কেন? তিনি বলেই ভালবাসি। তিনিই যে আমার সত্তা, তাঁর ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছুতেই যে আমার অন্তর ভরবে না, হৃদয় জুড়োবে না:

তাই তো

"পথের ধূলায় বসে
ভিখারী হৃদয় করে হায়, হায়
নাহি পাই, তবু চাই
সেও ভালো, সেও ভালো।"

ভক্তি আনে নির্ভরতা

আজ দুটি স্মরণযোগ্য কথা গুরু-গর্জনে যেন মনে ধ্বনিত হচ্ছে—

"যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ।
তবু যে না ছাড়ে, হই তার দাসের দাস॥"

* * *

"ভক্তি নিয়ে উঠলে মেতে হতেই হবে লক্ষ্মীছাড়া,
ভক্তি আনে নির্ভরতা, জীবন-মূলে দেয় সে নাড়া।
তাইতে দেবি, যাইনে ভয়ে তোমার কাছে,
প্রশ্ন শুধু শুধাই তোমায়, ভক্ত নামে
জাহির যারা, ভক্তি তাদের সত্যি আছে?"

('মায়ের কথা')

'মা'-ও আক্ষেপ করে বলছেন, "এই তো, এত ভক্তি। ভোগের বস্তু একটু কিছু পেলে বলে, 'আহা', ঠাকুরের কী দয়া!"

সাংসারিক সুখ-শান্তির নিরিখে তাঁর দয়া ও নিজের সৌভাগ্যের বিচার করলে বুঝতে হবে সংসারই আমার সত্যিকার ভালবাসার বস্তু। যে শান্তি শান্তিময়ের কথা ভুলিয়ে দেবে, এবং যা আসলে তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়ার ছল মাত্র, সে শান্তি যে ভয়ংকর অশান্তি ভক্তের পক্ষে।

রাজা 'সুরথ' রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রু-উৎপীড়িত, স্বপুরেও তাঁর স্বস্তি নেই, সেখানেও চতুর্দিকে ঘোর বিপজ্জাল। তবু চণ্ডীতে তাঁকে "মহাভাগ"—মহা সৌভাগ্যবান বলা হচ্ছে, কারণ এর ফলেই তিনি মাতৃ-অন্বেষী হয়ে

সংসার-মোহ কাটিয়ে মায়ের আশ্রয়লাভ করলেন। কোনটা চাই ঠিক করে ফেলতে হবে।

ভক্তি ও ব্যাকুলতায় আত্মপ্রকাশ

নিঝুম দুপুর, চারিদিক একেবারে নিথর নিস্তব্ধ। দূরে একটা কাকের কা-কা, আর চড়ুই-শালিখের কিচমিচি নিস্তব্ধতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলছে। বিরাট কোলাহলময় শহরের নিস্তব্ধ নির্জন এই দুপুর অদ্ভুত সুন্দর, কেমন একটা আবেশের বশে তা মনটাকে টেনে নিয়ে অন্তর্মুখী করে দেয়।

মানুষের অন্দর-মহলটি সত্যি কী এক রহস্য-পুরীই না? "মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু কথার কথা?" এ প্রশ্নে তাঁর বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেননি শরৎবাবু, লেখকদের মধ্যে যিনি মানুষের অন্তর নিয়ে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ভেবেছেন দরদীর মন দিয়ে। বিস্ময়-বিমুখ চিত্তে অনবহিত মানুষদের সচেতন করতে তিনি বলছেন—"তোমার কোটি কোটি জন্মের শত অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, লেখাপড়া এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে—এ কথাটা কি একবারও মনে পড়ে না? এও কি মনে পড়ে না যে অন্তরটি সীমাহীন আত্মার আসন?"

এই কোলাহলময় জগতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের অদৃশ্য অভ্যন্তরে অনবরত কী নির্মাণ-কাজই না চলছে! মহাকাশ অভিযানের চেয়েও অনেক বেশী চমকপ্রদ দুঃসাহসিক অভিযান মোক্ষার্থীর অন্তরাকাশ-অভিযান। মহাকাশবিজয়ীদের দৌড় গ্রহান্তর পর্যন্ত, আর অন্তরাকাশ-বিজয়ীরা উত্তীর্ণ হন একেবারে অনন্ত অমৃতলোকে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে' সর্বদুঃখহর রত্ন তুলে আনতে মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেন।

এ পরশরতনটি আমাদের অন্তরাশ্রয়ী পরম সাথী দেবেন অনুরাগময় অনন্যা ভক্তি ব্যাকুলতায় আত্মপ্রকাশ করে। তখন দেখবো তিনিই আমার

অন্তর, তাঁর অন্তরেই তো আমরা রয়েছি। যা ছিল দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা, তা হয়ে উঠবে সহজ মধুর সত্য।

যথার্থ ভক্তি

যথার্থ ভক্ত কে? একমাত্র 'তাঁর' ওপর নির্ভর করে যে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। এ যেন ছোট ছেলে মায়ের কোলে রয়েছে মার দিকে তাকিয়ে—ভারী আনন্দ। তার যেন ইচ্ছা—মায়ের মাঝে থাকে মাঝে মিলিয়ে যাই—শুধু মা আর আমি আর কিছু না থাকে মাঝে।

চেয়ে চেয়ে মাকে দেখতে দেখতে সে যখন আহ্লাদে আটখানা, যখন আর চেপে রাখতে পারছে না, তখন 'মা, মা' করে নির্মল খুশির হাসিতে উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। মায়ের কাছে রয়েছে, মায়ের কোলেই রয়েছে—ডাকবার কোন কারণ নেই, তবু অকারণ আনন্দে অকারণ ডাক! এইটিই হল সত্যকার ভক্তের—সেই মাতৃ-সর্বস্ব শিশুর সঠিক ছবি, একবার চিন্তায় মনের চোখে যা স্বপ্ন হয়ে ওঠে, এবং যে স্বপ্নের ঘোর আর কাটে না। ঠাকুরের কথা: "বাদুলে পোকা আলো দেখলে আর অন্ধকারে ফিরে যায় না"—

"তোমারে চেনার অগ্নিদীপ্তশিখা
উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহাতে জীবন অঞ্জলি।"

ভক্তের ব্যাকুলতা

রবীন্দ্রনাথের গানের ছত্র মনে অনুরণিত হয়ে আজকের ভাবনার খোরাক যোগাচ্ছে।

"তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে,
না চাহিলে তোমার মুখপানে
মন মোর বিরাম নাহি জানে।"

সান্নিধ্যলাভের এ ব্যাকুলতা যদি সত্যি হৃদয়ে জেগে থাকে তো বুঝতে হবে তিনিই আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে পড়েই আমার অন্তরে এই ব্যাকুলতাটি জাগিয়েছেন।

মহাদেব-এর বাড়ীতে 'ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সম্মুখী ভব, ইহ সম্মুখী ভব।'—এই যে আবাহন মন্ত্র ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় উচ্চারিত হয়েছিল, তা' যেন তাঁর কাছ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে আমাদের অন্তরে ঝংকৃত হচ্ছে—হয়েই চলেছে, 'বাবা, আমার কাছে এসে বস্, আমার সামনে আয়।'

আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য তাঁর এত আকুলতা জানলে তাঁর কাছে খালি খালি যেতে, তাঁর কাছে তাঁর সামনে বসে থাকতে, দু চোখ ভরে তাঁর স্নেহমাখা মুখখানি দেখার জন্য মন ব্যাকুল না হয়ে পারে ? আর ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় 'বৈমুখ্য', 'সাম্মুখ্যে' পরিণত হলেই সমস্ত বিষাদের তমিস্রা দূর হয়ে জীবনে আনন্দালোকের বন্যা নেমে আসে,—অন্ধকারের কীট তখন আলোর শিশু হয়ে দুলে ওঠে।

William James সুন্দরভাবে সেকথাই তো বলেছেন—

"We and God have business with each other and in opening ourselves to His influence, our deepest destiny is fulfilled."

ভক্তের ভাবনা

গ্রহণের শাঁখ বাজছে। গ্রহণ শুরু হয়েছে। বলে, গ্রহণের সময় যেটি চিন্তা করা হয় সেটিই জীবনের প্রধান জিনিস—ভেতরের জিনিস হয়ে যায় এবং সফল হয়। এখন চট্ করে ঠিক করে ফেলতে হবে আমার সবচেয়ে চাওয়ার জিনিসটি—চরম ইচ্ছাটি কি ? সেটি কি—তা' জানবার জন্য আকাশ-পাতাল ভেবে মরে এই পরম ক্ষণটি যেন বইয়ে না দিই। সেটি অন্তত স্পষ্ট এখন আমাদের কাছে। তাঁকে পেতে চাই, আমার জীবনে

আনতে চাই, আমার করে নিতে চাই—নিঃসন্দেহে এটাই আমাদের আকূতি, গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।

যাঁরা জীবনে তাঁকে পেয়েছেন তাঁদের মুখে শুনেছি, এর একমাত্র উপায় ব্যাকুলতার কান্না, কেঁদেকেটে তাঁকে অস্থির করে তোলা। খেলতে চেয়েছিলাম বলে চোখ বেঁধে 'সংসারে কানামাছি ভোঁ ভোঁ' খেলায় মা নামিয়ে দিয়েছেন। খেলা তো ভারী, খালি ধাক্কা খেতে খেতে মরছি। এবার 'বুড়ী' ছুঁতে পারলে বাঁচি। কিন্তু চোখের বাঁধনটা একটু আলগা না হলে সামনে থেকেও 'বুড়ী' ছোঁয়া আর কি হবে? তাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মাতৃদর্শনাভিলাষী রামপ্রসাদের সঙ্গে কান্নার সুরে বলতে হয়—

"খুলে দাও মা, চোখের ঠুলি—
দেখি শ্রীপদ অবিরত।"

ঠিক একই কথা বলছেন "তাঁকে" পেয়ে ধন্য পরিপূর্ণ হতে পেরেছিলেন যিনি, নাগপঞ্চমীতে সেদিন যাঁর জন্মোৎসব হল, সেই "শ্রীম"—

"'তাঁকে চাই', বলে শরীর-মন-প্রাণ সব তাঁতে মগ্ন করতে হবে। যায় যাক্ শরীর, কিন্তু তাঁর দর্শন বিনা আর বেঁচে থাকব না,—এমনি ব্যাকুলতা হলে তিনি কৃপা করে দর্শন দেন।"

তখন আনন্দ, কেবল আনন্দ, সর্বাবস্থায় আনন্দ, সকল কাজে আনন্দ—ভেতরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।

মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তখন জগৎ-সংসার তার ভুল হয়ে যায়।

ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক

সন্ধ্যা আসন্ন, মনটা সন্ধ্যা-সমাগমে কিছুটা যেন কেমন উদাস হয়ে যায়, ব্যাকুল হয়ে ওঠে মায়ের কাছটিতে হওয়ার জন্য, কাছে বসে দু'চোখ ভরে মায়ের স্নেহভরা মুখটি দেখতে—চেয়ে চেয়ে দেখতে, মায়ের দিকে শুধুই চেয়ে থাকতে।

ভক্তের ভগবানের দিকে চেয়ে থাকাটুকু এমনি এক অলিখিত

মহাকাব্য যা পড়ে শেষ করা যায় না। আন্তর-জীবনে কত লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্রর পর যে এই 'চেয়ে থাকাটুকু' পাওয়া গেছে, তার ইতিহাস কে জানে? তুচ্ছতার চোরাবালিতে, সংসারের জাঁতাকলে আটকে পড়া অসহায় আর্তকে 'কৃপা-ঘূর্ণি' হয়ে উড়িয়ে এনে নিজের কাছে বসিয়ে এই যে 'চেয়ে থাকাটুকুর' মধুরতম তৃপ্তিতে তাকে ভরিয়ে দিচ্ছেন, তাতেই তো বুঝি যে সত্যই তিনি—শংকরের স্তোত্রের ভাষায় "কৃপাসাগরী"।

এসেছি চাইতে, কাছে বসে তোমার দিকে চেয়ে থাকতে। কেন?

"না চাহিলে ও মুখপানে,
মন মোর বিরাম নাহি জানে।"

কী ভাগ্যবানই না তাঁরা, যাঁরা অকাজের যত সব কাজ ভুলে, 'মার্থার' বোন 'মেরীর' মত তোমার চরণতলে বসে অনিমেষ নয়নে তোমাকে দেখে মনের সাধ মিটোচ্ছে।

"এমনি করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
তোমাতে প্রাণ পূর্ণ করে রাখা,—
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই,
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে,
তোমায় দিতে চাঁই।"

আর তুমি? তুমিও তো তোমার বাৎসল্যভরা চোখে আমায় দেখছ আর দেখছ। তুমি মা, তোমার তৃপ্তি যে আমার ক্ষুদ্র সন্তান-হৃদয়ের তৃপ্তির অনন্তগুণ তা কি আর বলতে?

ভক্ত ভগবানের সম্পর্কের এখানেই পরিপূর্ণতা, চরিতার্থতা—যাতে আর সব ফিকে, জোলো হয়ে যায়। দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে আছে—দুজনেই পূর্ণ।

একজন আশ্রয় দিয়ে পূর্ণ, একজন আশ্রয় পেয়ে পূর্ণ—পরিপূর্ণ। অদ্বৈত তত্ত্বও এখানে তুচ্ছ। তাই তো 'কথামৃতে' (৪র্থ ভাগ) ঠাকুর স্পষ্ট

করেই বলছেন—'সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এস, তাহলে তো সবই হল।'

জয় মা : জয় ঠাকুর :—"জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।"

অহেতুক ভক্তি

প্রভুকণ্ঠের প্রার্থনা (Lord's Prayer)

"আমি দেহসুখ চাই না মা।
লোকমান্য চাই না মা।
অষ্টসিদ্ধি চাই না মা।
শতসিদ্ধি চাই না মা।

মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও, আর এই কর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই।

মা, আমি যন্ত্র ; তুমি যন্ত্রী।
আমি ঘর, তুমি ঘরণী।
আমি রথ, তুমি রথী।
যেমন চালাও, তেমনি চলি,
যেমন বলাও, তেমনি বলি,
যেমন করাও তেমনি করি।
মা, শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবানকে কি কারণে ডাকা, তাঁকে লাভ করেই বা কী ফল—এসব কিছুই জানি না, অথচ তাঁকে না ডেকে কিছুতেই প্রাণ স্থির থাকে না, তাঁর চরণে সর্বস্ব সমর্পণ না করে হৃদয় মানে না,—প্রাণ-নিঙড়ানো এ ভক্তিকে বলে "অহেতুকী ভক্তি", যেমন প্রহ্লাদের ভক্তি। কোন কামনাই —এমন কি ভবযন্ত্রণা হতে মুক্তির বাসনা তাঁর মনে জাগেনি। তাঁর মনপ্রাণ হরি ভিন্ন আর কিছুই আপনার বলে বুঝত না। সেইজন্য তিনি 'হরি' 'হরি' করে বেড়াতেন। হিরণ্যকশিপুকে বালক প্রহ্লাদ বলেছিলেন :

'আমি হরিনাম ছাড়ব কি করে ? হরি যে আমার অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।' হৃদয়ে হৃদয়ে এই অহেতুকী, নিষ্কাম, অমলা ভক্তির মাধুর্য সঞ্চার করতেই তো পরিপূর্ণ ভালবাসার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে, পরিপূর্ণ ভালবাসা দিতে ও নিতে তিনি বার বার আমাদের কাছে এসেছেন। এবার এসেছেন অপরূপ যুগ্মরূপে।

"মরি। মরি। রূপ হেরি,
নয়ন ফিরাতে নারি—
হৃদয়-সন্তাপহারী সাধ ধরি
হৃদি পদে।"
'জয় মা। জয় ঠাকুর।'

তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্

ঠাকুর বললেন, "জগতে মাকে পেলে, সব পাবে। জগতের মাকে পেতে হলে শরণাগত শিশুর, বেড়াল-ছানার মত, মায়ের ওপর পূর্ণ নির্ভরতা চাই, জানালেন। শুধু মায়ের একান্ত নির্ভর শিশু হয়েই যে মায়ের সঙ্গে নিবিড়তম সম্পর্কে আসা যায়,—মাকে পরিপূর্ণভাবে, যোল আনা নিজের করে তখনই আমরা পেতে পারি, এই শিক্ষাই তো পরম-সুন্দর দিব্যশিশুটি আমাদের দিয়ে গেলেন তাঁর সমগ্র জীবনের স্বর্ণ-লিপিতে। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি ছাঁচ গড়ে গেলেন, আমাদের জীবনটি সেই ছাঁচেই ঢেলে নিতে হবে। এ তো নীতিশিক্ষা, নীতিপালনের ব্যাপার নয়। শুধু ভাল হওয়া, সচ্চরিত্র হওয়াই তো উদ্দেশ্য নয়, আকাঙ্ক্ষাটি যে 'তার' হওয়া—ভক্ত হওয়া।

শরণাগত ভক্ত মায়ের কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশু। তার মুখে কান্না ছাড়া ভাষা নেই, আর তার সমস্ত কান্না মায়ের জন্য : এই তার একমাত্র মন্ত্র—মাতৃমন্ত্র। সে এখন সম্পূর্ণভাবে মাতৃনির্ভর, তাকে—রাখতে চাও তো রাখ, ফেলতে চাও তো ফেল। তার কিছু বলবার নেই, কইবার নেই, বোঝবার নেই,—সে সর্বতোভাবে সমর্পিত।

যখনই তার বুদ্ধি হবে, মুখে ভাষা ফুটবে, তখনই সে অভিযোগ শুরু করবে, জানতে চাইবে—মানতে চাইবে না, তার স্বাতন্ত্র্যবোধ তাকে মাতৃসান্নিধ্য বঞ্চিত করবে। এ যে, কবির ভাষায় 'ভীষণ লোকসানের ভয়ংকর লাভ।'

সেই জন্য উপনিষদের ঋষি এই কল্যাণ নির্দেশই দিচ্ছেন যে

"পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেনাস্তিষ্ঠেৎ।"—

পাণ্ডিত্যকে,—অধ্যয়নলব্ধ সংস্কারগত বুদ্ধিকে অতিক্রম করে, বাল্যে অর্থাৎ উপলব্ধির সারল্যে প্রতিষ্ঠিত হও। মাতৃভাবনায় ও ঠাকুরের চিন্তায়, আমাদের শিশুরূপটি ফুটে উঠুক, আমাদের ভেতরের হারিয়ে যাওয়া শিশু-

টিকে ফিরে পেয়ে সেটিকে যেন তাঁদের চিরশিশু করে নেওয়ার জন্য তাঁদের চরণে সমর্পণ করি।

শরণাগত শ্রীচরণে

অস্থিরচিত্ত, অশান্ত গিরিশের কানে "বকলমার" অমৃতমন্ত্র দিয়ে অহেতুক দয়াসিন্ধু ঠাকুর ওই চিন্তাজর্জরিত যুগের সর্বমানবকে তাঁর অভয় চরণে আত্মসমর্পণের মন্ত্রে দীক্ষা নেবার বিধানই প্রবর্তন করলেন। তাঁর পুণ্যচরণের ধূলিরেণুর উপর জীবনের ভার নামিয়ে দিতে পারলেই আমরা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, সহজ স্বচ্ছন্দ শৈশবের আনন্দময় দিনগুলিতে ফিরে যেতে পারব। ঠাকুরের আবির্ভাব যেন মহাসমুদ্রে সূর্যোদয়, আনন্দিত বিস্ময়ে মন ভরে যায়, মাথা নুয়ে আসে—

অন্তহীন জলধিতীরে
প্রণামের আলপনা আঁকি।
সে জল, সে আলো পেলে
জীবন ফিরিয়া পাব—
এ আশ্বাসে, এ প্রত্যয়ে স্থিত হয়ে থাকি,
তোমারেই ডাকি।
আমি শরণাগত চরণে,
'নাহং', 'নাহং', 'তুঁহু', 'তুঁহু',—
সদা যেন রয় স্মরণে।
"হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ
কর তোমাগত প্রাণ!"
'জয় মা। জয় ঠাকুর'।

নিজেকে বিলিয়ে দে তুই শূন্য করে

গীতামুখে ভগবান আকুলভাবে বলছেন 'তৎকুরম্ব মদর্পণম্'—'তোমার' জীবনটা আমাকে দাও।

তাঁর হয়ে যেতে হবে,—সম্পূর্ণভাবেই তাঁর। নিজেকে উজাড় করে দিতে হবে তাঁর হাতে। আহা! সেই জন্যই তো সেই মহাভিক্ষুক আমার কাছে এসে হাত পেতেছেন, দু'হাত তাঁর ভরে দেওয়া চাই, সব 'পাটোয়ারী' ছেড়ে।

"মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।"

সব সময় এ ভাবটি মনে জাগিয়ে রাখতে হবে যে তিনি তোমার কাছে এসেছেন এবং সর্বক্ষণই তোমার কাছে রয়েছেন। এ কথাটা ভাল করে বুঝে নিয়ে তাঁর সান্নিধ্যবোধ করতে হবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শিখতে হবে। সাধু লরেন্সের (BR Lawrence-এর) নির্দেশও তাই—

"Practise the presence of God through
Continual conversation with God."

মনকে বাঁধ তাঁর চরণে

কেঁদে বললে তিনি তার ভার নেন। কেঁদে বলা, চেষ্টা করে না পারলে। ঠিক ছোট শিশুটির মত হয়ে যেতে হবে, জড়িয়ে ধরতে হবে তাঁকে—তবে তো তিনি কোলে তুলে নেবেন। 'মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক!' এর চেয়ে নিরাপদ প্রার্থনা আর কি আছে বল? আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, চাইলে শেষে কোন উৎপাত জোটে কে বলতে পারে? ভগবান বলছেন, আমার সঙ্গে একটা 'সম্পর্ক' পাতিয়ে থাক, তাহলে সংসারের দুঃখ আর দুঃখ বলে বোধ হবে না।

ঠাকুর বলছেন, 'আমাকে ধর'। এ যেন ছেকল দিয়ে তীরে নৌকা বাঁধা ; তুফানে উল্টে দেয় কিছু ছিঁড়তে পারে না—অতলে তাকে তলিয়ে দিতে পারে না। সংসারে ঝড় তুফান উঠবেই, এর মধ্যে কিছুটা স্থির থাকতে যদি কেউ চায়, তবে এই মনকে তাঁর চরণে বেঁধে রাখতে হয়।

তাহলে ওসব ঝড়ঝাপটা মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়, ঝড় যতই সোঁ সোঁ গর্জন করতে থাকুক, ভয়ে আর প্রাণ উড়ে যায় না, 'ছাদের তলায়' আছি যে।

তোমায় আমায় মিলন হ'লে

"অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ
থাক চিরদিন অনন্ত অপার—
যত পাছে ছুটে যাব আমি
তত আরো আরো দূরে রবে তুমি;
যতই না পাব, তত পেতে চাব
ততই বাড়িবে পিপাসা আমার।
ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি—
তোমাতে আমাতে হব একাকার।"

শুধু মন নয়, সমগ্র সত্তাটি তাঁর মধ্যে বিলীন করে দিতে হবে। 'অহং' বলে কিছু রাখা চলবে না।

"আনন্দময়! তোমার এ সংসারে
আমার কিছুই আর বাকী না রবে।"

এবং যতদিন তা না হয়, ততদিন চলুক তোমার আমার এই আনন্দের লুকোচুরি। বুঝেছি মা, এইভাবেই তুমি তোমাকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য আমার হৃদয়কে ব্যাকুল করতে চাচ্ছ যাতে আকুলতার সঙ্গে নির্বাধ দর্শনের, একাত্মতার পরমতৃপ্তির জন্য ক্রন্দন সঙ্গীতে আকাঙ্ক্ষা জানায়—

"খুলে দে মা, চোখের ঠুলি—
দেখি শ্রীপদ অবিরত।"

নিজেকে সঁপে দিতে কোথায় পাব তাঁরে

বাউলের গানের কলিটি মনের মধ্যে গুন্‌গুন্ করছে—

'আমার মনের মানুষ যে রে
আমি পেলাম না তারে,
তারি উদ্দেশ্যে
ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে।'

এই তো মানুষের—হ্যাঁ, সব মানুষেরই, গোপন হৃদয়ের কান্না। তার জীবনটাই—জীবনের সব ব্যাপৃতি—প্রচেষ্টাই, 'পরমপ্রিয়ের' সন্ধানে নিবদ্ধ—জীবনভোর সে খুঁজে চলেছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের সুযোগটি যাতে সে পেতে পারে পরিপূর্ণ চরিতার্থতার পরিতৃপ্তি। বিষয়ভোগ, যশ-খ্যাতি, প্রতিপত্তি, জাগতিক ভালবাসা প্রভৃতি কত কিছুর ভেতর চরিতার্থতা লাভ করতে চেয়েছি এবং শুধু নিরাশই হতে হয়েছে। চাইছি যে একটানা অফুরন্ত আনন্দ, তা কিন্তু পাইনি কখনও, তবু 'মরিয়াও মরে না আশার' মত সেই মরীচিকার পেছনেই আবার ছুটেছি।

কিন্তু কোন এক পুণ্যলগ্নে এ মোহ আমাদের কেটে যায় এবং আমরা বুঝি আনন্দ তিনিই, এখানে ওখানে আসলে তাঁকেই খুঁজেছি, 'পরিপূর্ণ ভালবাসার পরিপূর্ণ পাত্র' চেয়েছি এবং সেই অমৃতপাত্রটি দিব্যদৃষ্টির সামনে যখন উদ্ভাসিত হয় তখন জীবনটা তাতে উজাড় করে দেওয়ার জন্য অধীর হয়ে বলি—

"এখন শুধু আকুল মনে যাচি,
তোমার পানে খেয়াতরী ভাসা।"

বাসা পাকড়াও

গীতায় ভগবান বলছেন :

"অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।" (গীঃ ১২)

ঠিক ঠিক ভক্ত কে? না, যে 'গৃহ' হারিয়েও অস্থির হয়ে পড়ে না, যাকে অবলম্বন করে জীবন কাটাচ্ছিলাম এবং কাটাব ভেবেছিলাম তার বিমুখ হলেই, 'সর্বনাশ হ'ল। আমার কি হবে? দাঁড়াব কোথায়?' ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে না। কারণ ভগবানকেই যে সে ঠিক ঠিক মনেপ্রাণে

তার অবলম্বন, 'আশ্রয়' করে নিয়েছে ; ঠাকুরের কথায় সে যে 'বাসা পাকড়েছে'। সে সমগ্র অন্তর দিয়েই তো বোধ করে ঃ

"সবাই ছেড়েছে যারে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার—
আছে তব স্নেহ।
নিরাশ্রয় যে জন, পথ যার গেহ—
সেও আছে তব ভবনে ॥"

এরা 'মায়ের বাড়ীর' লোক, মা-ই এদের বাড়ী ঃ নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়,—ভালোবাসা-ভরা ভাল বাসাটি।

সে তো 'স্থিরমতিঃ' হবেই, হাঁ, 'অনিকেতঃ' হয়েও 'স্থিরমতিঃ'
কারণ সে যে ঠিক ভক্তলোক—'ভক্তিমান নরঃ'।

রামকৃষ্ণ পার্ষদ প্রেমানন্দ ভগবৎপ্রেমে বিভোর হয়ে সেই প্রসিদ্ধ বাউলের গানটি গাইতেন—

"ও' ভাই! প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর
চৌদ্দভুবন ধ্বংস হলেও,
সে আসমানেতে বানায় ঘর
ও' ভাই! প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর।"

এমন প্রেমিকজনের কথা ভাবতে গিয়ে কি মন আকুল হয়ে ওঠে না? এই মর্মভেদী বিলাপ হৃদয়ে জাগে না? 'কবে হবে সে প্রেমসঞ্চার?' তখন মন তাঁর দুয়ারে পড়ে থেকে শুধু বলতে চায়—

"ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা,
'তু' দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥"

এখন যেটি প্রীতিকর আবাস বলে মনে হচ্ছে সেটি যে "পরের" জায়গা ভুলে না যাই। বাসে "Ladies Seat"-এ বসলে ভয়মিশ্রিত রসিকতা করে যেমন বলে, 'পাকিস্তানে বাস'। অর্থাৎ যে কোন সময়ে উঠতে হতে পারে।

তাই মনকে বলা দরকার বৈকি—

"মন চল নিজ নিকেতনে,

সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?”

জয় মা ! মা-ই আমাদের “নীড়”, মা-ই আমাদের আকাশ। ওড়ারও জায়গা, বিশ্রামেরও স্থান।

কোথা মা, এস মা

শরীরটা বিগড়েছে। বেশ একটা অস্বস্তি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হচ্ছে এবং এর থেকে যে দেহকেন্দ্রিকতার প্রত্যক্ষ পরিচয় হচ্ছে তা শরীরের অস্বস্তিকে মানসিক অস্বস্তিতে পরিণত করছে। কিন্তু আবার এও তো সত্য যে, এসব সময়েই ‘দুর্বল শিশুর’ মত নিজেকে মনে হয় এবং ‘মা, মাগো !’ ডাকটি ঠিক মাতৃসান্নিধ্যকাঙ্ক্ষী অসহায় শিশুর ক্লিষ্ট-কণ্ঠেই বেরিয়ে আসে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল অনুরণিত হয়ে ওঠে মায়ের স্নেহভরা কণ্ঠের মধুবর্ষী সাড়া পেয়ে—‘এই তো বাবা, এই যে আমি !’ আর সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লেশ কোথায় চলে যায়, আর ভারী একটা আরাম লাগে। মা যে ক্লেশহারিণী মা, যতটুকু এবং যেমনই হোক এসব অনুভূতির মূল্য অসীম। আমাদের স্নেহের শান্তিকুমারের ‘মাতৃঅর্ঘ্যে’র ছত্রটির আবৃত্তি তখন মনে চলতে শুরু হয়।

“নিশ্চল দেবীর মূর্তি। ভক্ত তবু জানে নিঃসংশয়
দেবীবক্ষ ওঠে নামে ধূপগন্ধ পবিত্র নিঃশ্বাসে।”

অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে

অসীম আনন্দ পারাবার, ‘মা’-ই তো আমার আমি-রূপ ছোট্ট ঢেউটির সত্তা, স্বরূপ, সর্বতোভাবে একাকার এক।

কিন্তু হঠাৎ কী দুর্মতি হল, অহংকারের চাদরে মনকে, আমার কায়াকে জড়িয়ে নিয়ে নিজের এক পৃথক রূপ, পৃথক ব্যক্তিত্বের একটি ‘মিথ্যা

আমির' পোঁটলা সৃষ্টি করলাম। শুরু হল সেই ভারী পোঁটলা নিয়ে উল্টো দিকে চলা, 'সংসার-হাটের' পথে যাত্রা—শুরু হ'ল যন্ত্রণা।

সংসারের পথে নেমেছি অহংকারের বসন জড়িয়ে—'আমার নাম যাহার সকল অঙ্গে লিখা।' তাই 'মা' আড়াল হয়ে পড়েছেন, তাঁকে, আমার আনন্দস্বরূপকে ভুলেই যাচ্ছি। এই ভুলে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা অভাববোধ করছি এবং তা' পূরণের জন্য, সুখের খোঁজে বিষয়ের কণ্টকারণ্যে ঘুরে ঘুরে মরছি ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে।

হঠাৎ তাঁর কৃপায় যেন চেতনা ফিরে পেয়েছি, বুঝছি শিশুর আনন্দ শুধু মায়ের কোলেই। সে কোলটিতে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল ব্যাকুল এখন প্রাণ। অহংকারের মলিন বসনটি ফেলে, মাতৃনামাবলী—আমার নামের জায়গায় 'মায়ের নাম্ হবে যার সর্ব অঙ্গে লিখা', শুচিস্নাত আমার দেহমনের সুন্দর বসন ও উত্তরীয় হয়ে আমার পরিচয় দিক, 'মায়ের শিশু' মায়ের, শুধু মায়েরই শিশুরূপে।

যে 'আমিত্ব' সংসারের মানুষের এত প্রিয় বস্তু যে বলা হয় "the sweetest music to a man's ear is the sound of his name," সেটা এখন বুঝছি নামের জন্য বিশ্রী কাঙালমী ছাড়া তো আর কিছুই নয়।

"Sweeter, Oh ! far, far sweeter than the (so called) sweetest music, is the enthralling sound of my Beloved Mother's Name."

মাতৃনামের অমিয় ঝংকারে আমার মনপ্রাণ সদা ঝংকৃত হয়ে উঠুক।

মায়ের পরশে

নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মত আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরণা ঝরতে থাক্, আমাদের অণু-পরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্, এই পাষাণটিকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্—তারপর

এটা সরিয়ে দিয়ে ক্ষইয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ আকাশ রচনা করে সেই আকাশটিকে পূর্ণ করে দিক।

দেখো, একবার ভেতরের দিকে চেয়ে দেখো—অন্তরের সংকোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ হচ্ছে এবং ঠাকুর-মায়ের মহিমা এই জীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠছে। জয় মা ঃ জয় ঠাকুর!

"আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।"

নির্ভার—নির্ভর—নির্ভয়

গীতামুখে ভগবান অর্জুনকে উপলক্ষ করে দিশেহারা জগতের মানুষকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছেন মনটা তাঁকে দিতে। "ভজস্ব মাম্।" কেন? কারণ যে সংসার দিয়ে তোমার চেতনার অণু-পরমাণু ভরিয়ে রেখেছ, তা যেমন 'দুদিনের খেল্', তেমনি সে খেলায় মজার লেশমাত্র নেই—এটি 'অনিত্যম্ অসুখম্ লোকম্'। ঠাকুর আরও স্পষ্ট করে জানালেন, 'সংসার আমড়া,—আঁঠি ও চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল'। সংসারে স্বস্তি নেই, এটা বুঝলে প্রাণের ভেতর ব্যাকুল প্রার্থনা জাগে ঃ

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে।"

মাথায় কত বোঝাই না চাপিয়েছি দিনে দিনে! তোমাকে প্রণাম করে সে বোঝাকে এক এক করে নামিয়ে দেব তোমার পায়ে। এমনি করেই ভারমুক্ত হব।

আর নির্ভার হলেই চরম নির্ভর। তখন নির্ভয়।

'তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে / রাজে যেন সদা রাজে গো'

মানুষ জীবনে চারিদিক অন্ধকার দেখে যখন একান্ত অসহায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ঠিক তখনই মধুরতম সঙ্গীতের মতো তার কানে ভেসে আসে প্রিয়তমের নির্দেশ : 'তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্' !—তোমার জীবন বাঁশীটি তুলে দাও আমার হাতে, আমাকে সেই বাঁশীটি বাজাতে দাও। জীবনতরীর হাল আর তোমার হাতে রেখো না, আমাকে হাল ধরতে দাও, এবং তারপরই শুরু হয় তাঁকে নিয়ে জীবনের নতুন নাট্যলীলা। নতুন করে জীবনের নাট্যলীলার সূত্রপাত হল তাতে আমার প্রাণের ঠাকুরের ভূমিকা, অঙ্কে অঙ্কে—দৃশ্যে দৃশ্যে। আমাদের সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, সম্মান-সমাদর ও অপমান-লাঞ্ছনা,—সমস্ত কিছুর ওপরই তাঁর চরণচিহ্ন কোটী চন্দ্রের স্নিগ্ধ সুশীতল জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করছে। সুতরাং সব কিছুতেই 'নটরাজের' আমাকে নিয়ে বিচিত্র নাট্যের মুগ্ধ দর্শক হতে হয়।

"সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,

... .

তোমারে যেন না করি সংশয় ॥"

জীবননাট্যে এখন আমার ভূমিকা শুধু অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁকে আরাধনা করা ভজনা করা।

হ্যাঁ, মাত্র শুধু দর্শক হলে তো চলবে না। আমাকেও নাটকে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং নাটকটির সাফল্য আমার ভূমিকা যথাযথ পালনের ওপরই নির্ভর করে বুঝতে হবে। ঠাকুর শুধু তো ভগবৎ-কৃপার কথাই বলেন নি, ঐকান্তিক সাধনার নির্দেশও দিয়েছেন। আর সাধনা তো এই স্মরণেরই সাধনা। তাই গীতায় ভগবান বলছেন—'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তঃ, মদ্‌যাজী, মাং নমস্কুরু।' শুধু তোমার মনকে আমার চিন্তা দিয়ে ভরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়, তোমার সমস্ত হৃদয়কেও কি আমার দিকে উন্মুখ করে রাখবে না? আবার 'মদ্‌যাজী' হও, তোমার জীবনের ছোটবড়ো সমস্ত কর্মই আহুতি-স্বরূপ সমর্পণ করো আমাকে, যাতে তোমার জীবনটি হয়

একেবারে "Ramkrishna-centred, Ramkrishna-circumferenced, Ramkrishna-soaked."

'তুমি ছাড়া, এ জীবনে আর কিছুই না রবে'।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—
আসিবে সেদিন আসিবে।"

জয় মা, জয় ঠাকুর।

পরমা প্রেম-রূপা।

প্রেমের দাস

একটা ভাবনা আজ মনকে বেশ একটু বিচলিত করে তুলেছে, অকর্তব্যের দায়ে যেন আমাকে অভিযুক্ত করতে চাইছে। জগতে এত দুঃখ, মানুষের এত ব্যথাবেদনা, উদ্বেগ-অশান্তিতে আজ মানুষ জর্জরিত। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় ব্যর্থতা-নৈরাশ্যের গ্লানিতে বুকফাটা আর্তনাদ করছে কত অভাগা। এই সব অভাজনদের দুঃখ তোমার অসাড় চিত্তে একটুও রেখাপাত করে না, তাকে কিছুমাত্র ভারাক্রান্ত করে না? ছিন্ন অথচ তোমার 'ঠাকুরের' প্রথম পরিচয়ই, তিনি 'ব্যথার ব্যথী', করুণায় তাঁর অবতরণ, করুণায় তাঁর কত না অশেষ যাতনা ক্লেশ বরণ, প্রেমের দায়ই তো তাঁকে টেনে এনেছে অক্ষোভ্য প্রশান্তি থেকে সংসারের অশান্তি জ্বালার ভেতরে। যদি তুমি তাঁকে সত্যি ভালবাস তাহলে তাঁর দায় যে তোমারও দায়, আর প্রেমের দায়ের এই বিরাট উত্তরাধিকার তিনি তোমার জন্য রেখে গেছেন। কাউকে 'পর' করে রেখো না, সকল ব্যথার সাথী হওয়ার আকুলতা হৃদয়ে জাগাও, তাদের জন্য যদি কিছু নাও করতে পার তাদের চোখের জলের সঙ্গে তোমার চোখের জল মিশুক, তাতেই তাদের জ্বালা একটু জুড়োবে, ব্যথা হালকা হবে। 'Sorrow shared is sorrow halved!' নজরুলের পত্রের ভাষায় যেন বলতে পারি, —'সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি। এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পারি।' এ কথায় তো রয়েছে স্বামীজীর কথারই প্রতিধ্বনি।

আত্মজাগরণে ভালবাসা

মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে, নতুন করে, পেতে

চাচ্ছে। আত্মাকে এজন্য আত্মপ্রবঞ্চনার নিদ্রা থেকে জাগাতেই হবে। আত্মার এই জাগৃতিতেই তো ধর্মোপলব্ধির সার্থকতা এবং এই জাগরণে খোলে ভালবাসার দৃষ্টি। পরমপ্রেমস্বরূপের সঙ্গে তার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে মুহূর্তে মানুষ আবিষ্কার করে সেই মুহূর্ত থেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থান্ধ গণ্ডীতে আর সে বাস করতে পারে না,—ভালবাসার বন্যায় তার গণ্ডী-দেওয়া পুরাতন 'বাসা' ভেসে যায়, সেও সেই বন্যায় দিশেহারা হয়ে ভেসে এক অজানা দেশে এসে পৌঁছায় যেখানে সে পায় সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তির 'স্নেহনীড়টি' যার সন্ধানে সে ফিরেছে জন্মজন্মান্তর। ভরা মনে যেতে যেতে পথের দিশারীসাথীটির কাছে সে খালি তার আনন্দ-বিহ্বলতা প্রকাশ করে জানায়—

"কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই ;
তুমি যা বলাও, আমি বলি তাই।
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে,
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগলবেশে।"

স্নানযাত্রা অর্থাৎ ভালবাসার জয়যাত্রা

কাল স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রার পরই নবকলেবরে ৺জগন্নাথ রথারূঢ় হন এবং রথযাত্রার উৎসবে রাজপথ অগণিত মানুষের আনন্দোচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে। সমস্ত ব্যাপারটা কী গভীর ভাবব্যঞ্জক!

'সৎ' ভাবনায় (অর্থাৎ সৎ স্বরূপের চিন্তায়) মনকে অভিস্নাত করাই স্নানযাত্রার প্রকৃত তাৎপর্য। তাতে হৃদয়ে সৎস্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হয়ে দেহরথে ৺জগন্নাথের আনন্দোজ্জ্বল প্রকাশ হয়, জীবনের ধূলিধূসর পথে রথযাত্রা শুধু হয় এবং নিঃসঙ্গ ক্লান্তিকর দুর্বহ জীবনযাত্রা তখন সকলের সম্মিলিত যোগে রথযাত্রার উৎসবে পরিণত হয়। আর তখনই পাই সেই আনন্দের সন্ধান, যে আনন্দে সীমা নেই, প্রিয়বিরহ নামে শোক

নেই, অনিষ্টপ্রাপ্তি নামে দুঃখ নেই,—আছে শুধু সত্তা, শুধু জ্ঞান, শুধু আনন্দ।

আর আছে অসীম অনন্ত প্রেম যা সর্বদিকে, সকলের প্রতি প্রবাহিত হতে চায়, যার অনুভূতিতে আমরা ভালবাসাময় হয়ে যাই, সকলকে ভালবাসতে, আত্মীয় করে পেতে মন উন্মুখ হয়। সংস্বরূপ যে আসলে 'অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ', জীবনে তাঁর প্রকাশের প্রথম ফলই তো এই যে 'পর' নিজের হয়ে ওঠে এবং অন্তরের যে রিক্ততা মহামারীর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে তার অবসান হয়। 'রথের দড়ি' তো এই সম্পর্কেরই প্রতীক। এটি বুকে তুলে ধরতে হবে; ধূলায় পড়ে রয়েছে বলেই সব অনর্থক।

প্রেমে জগৎ জয়

কতবার বলা হয়েছে, তবু আবার বলতে হয়—কারণ কথাটা যে ঘুরে ফিরে খালি মনে আসে।

প্রচার নিরপেক্ষভাবে এই বস্তুতান্ত্রিকতার যুগে হৃদয়ে হৃদয়ে ঠাকুর-মায়ের প্রতিষ্ঠার বিরাট আনন্দযজ্ঞের যে আয়োজন চারদিকে চলছে, এ অঘটনটি ঘটছে কী করে, উত্তরটি সহজ—এ সেই 'Magic of Love'—ভালবাসার যাদু।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ সুন্দর বলতেন—" 'রামকৃষ্ণ মিশন' কি জানিস? রামকৃষ্ণের মিশন। আর রামকৃষ্ণের মিশন হলো, ভালবাসা দিয়ে জগৎ জয় করা।" আর এ ভালবাসায়, মায়ের কথায় জোয়ার-ভাঁটার ওঠা-পড়া নেই, এ একটানা। এই অকৃত্রিম পবিত্র ভালবাসার নিরন্তর স্রোত, সে যত ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক না কেন, যে হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়, সে জীবনটি নিঃসন্দেহে রামকৃষ্ণ-সারদা-কৃপাধন্য। আর তাই তো পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাঁর পত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ভক্তসন্তানকে লিখছেন: 'ভালবেসে সকলকে কিনে ফেল। এই হচ্ছে জ্ঞান, এই হচ্ছে ভক্তি, এই নব যুগের—রামকৃষ্ণ-সারদা যুগের।'

এতে বিখ্যাত কবি Ezra Pound-এর ছত্রগুলি মনে আসে—

"What thou lovest well remains.
The rest is dross.
What thou lovest well shall not be
Reft from thee
What thou lovest well
Is thy true heritage."

তাঁর কৃপা ভালবাসার উৎস

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
সহসা পশিল হৃদয় পর,—
কে জানে কেন রে
গুহার আঁধারে জাগিল
প্রভাত পাখির গান।"

মন পুলকিত হয়ে উঠছে ঠাকুর-মায়ের যে কৃপা, করুণা, ভালবাসা সর্বক্ষণ আজকের বর্ষাস্নাত প্রভাতের শুভ্র-কোমল সূর্যালোক আমাদের ঘিরে রয়েছে তার কথা হঠাৎ আমাদের বোধে পরিস্ফুট হওয়ায়। নাগ মশায় ঠাকুরের স্মরণমাত্র শুধু 'কৃপা', 'কৃপা', 'কৃপা' বলে বিহ্বল হয়ে যেতেন। আবার কখনও আবেগজড়িত কণ্ঠে খালি বলতেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল" :

ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ বলতেন, 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'কখনও গালে হাত দিয়ে ভাববিনি।' এবং সেই থেকে কখনও গালে হাত দিয়ে ভাবিওনি। আর কেন ভাবব? তাঁর ভালবাসায় একেবারে ভরপুর হয়ে আছি। তাঁর স্পর্শ যে পেয়েছে তার ভেতরটা ভালবাসার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় তুষারশীতল হয়ে যাচ্ছে, বাইরে যতই অশান্তির আগুনের জ্বলুনি-পুড়ুনি থাকুক না। সে অভিভূত হৃদয়ে বলে—

'ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়, হে দীনশরণ।
মাগে বা না মাগে, কৃপা বিলাও ধরায়, বরিষার বারি।
ভুলায় যন্ত্রণাজ্বালা, তব নাম জপমালা অহংকার দমিত দানব।
অর্চনার অধিকার বিপুল বৈভব।'

ভালবাসা আনে মুক্তি

আমি তোমাদের জীবনপথের পাথেয় স্বরূপ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসাটুকু দিতে চাই। কারণ জীবনের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলতে আর কিছুরই আবশ্যক নেই, আবশ্যক কেবল প্রাণভরা এই ভালবাসাটুকু। সকলে যেন সকলকে সেই ভালবাসা দেয় যাতে জীবনপথের সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে পথযাত্রা আনন্দময় করে।

ঐ দেখ, কচি ছেলেটাকে বুকে করে মা সংসারের পথে চলেছে। ঐ ছেলেটার ওপর মায়ের প্রাণটিকে বেঁধে দিয়েছেন তো স্নেহসর্বস্বা সেই পরমাজননী। ঐ ছেলেটিকে দিয়ে তিনি মাকে জীবনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, গুণ যেমন নৌকোকে বেঁধে উজানে টেনে নিয়ে যায়। প্রেমের প্রভাবে পথের সব কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হয়ে উঠছে।

একটি ছেলে এসে মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করে দেয়। ভালবাসা আমাদের নিজের ভেতর থেকে বের করে অন্যের দিকে নিয়ে গিয়ে তাকে নিজের চেয়ে বেশী করে তোলে, এইজন্যই তো তাকে 'পথের আলো' বলি, তা পথকে গৃহের মতো আনন্দোজ্জ্বল ও মধুর করে। সত্যকার ভালবাসা আমাদের মুক্তই করে, বন্ধ করে না।

সকল সময় আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু স্নেহশীল হৃদয়ের ভালোবাসা সহস্র দিক থেকে তার বাহু আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই বিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য করে চলতে শিখি, স্বার্থকেন্দ্রিকতার মোহে লাভ-লোকসানের হিসেবে যেন জড়িয়ে না পড়ি, যার ফলে শেষে সংসারের কঠোর শাসন শৃঙ্খল আমাদের আসামীর মত বেঁধে নিয়ে না যায়। প্রেমের টানে চললে মাতৃস্নেহের মত

জগতের শোভা সমস্ত পথই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে তখন সব শ্রান্তি ভুলে মন গেয়ে ওঠে—"আমাদের পথ চলাতেই আনন্দ।"

প্রেমের প্রবাহে ভাসাও ভেলা

স্বাবলম্বী পুণ্যবান হওয়ার চেয়ে বরং তাঁর শরণাগত পাপী হওয়া আমার কাম্য। যে জীবনে ভক্তি অনুরাগের স্নিগ্ধতা সর্বতোব্যাপ্ত, যে জীবন তাঁর কৃপার অজস্র বরিষনে নিত্য অভিস্নাত, যেমন ভক্ত ভৈরব গিরিশের জীবনটি কি লোভনীয়। জলে নৌকা বাওয়া কষ্টের ব্যাপার নয়, নদীর ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে মাঝি তার ডিঙিখানি বেয়ে চলে গান গেয়ে। কিন্তু সেই নৌকাটি ডাঙ্গার ওপর দিয়ে টেনে নিতে হলে প্রাণ বেরিয়ে যায়, একেবারে দশ ডাক ছাড়িয়ে ছাড়ে। জীবন-নৌকার তলে যদি প্রেমভক্তির প্রবাহ থাকে তাহলে জীবনযাত্রা তো আনন্দের নৌকাভ্রমণ—Delightful boat rowing।…কিন্তু সেই জীবন যদি ভক্তিহীন শুকনো বালুচর হয় স্বার্থদ্বন্দ্ব কাঁকর-পাথর-কাঁটা যার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তাহলে নৌকাটিকে টেনে নিতে হয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে, রক্ত জল করে। তাই তো গীতায় অর্জুনকে তাঁর পরম সখা জানালেন : 'আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবন কাটাও, কোন যন্ত্রণা থাকবে না, বরং উত্তরোত্তর আনন্দ উল্লাসে প্রাণ মেতে উঠবে।

অখণ্ড পূজার জীবনে 'আমি আমার' ভাবটি একেবারে মুছে গিয়ে সর্বত্র তাঁর চরণ-চিহ্নই জ্বলজ্বল করে। তাই তো ভগবৎ নিবেদিত জীবন ভারী সজীব সুন্দর, তাতে চিরন্তন শুক্লপক্ষ—চন্দ্রের নিত্যনূতন শোভা।

ভক্ত-ভগবান-দুহুঁ দোঁহার

ভাবতে গিয়ে সত্যি মনটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে ওঠে ;

"আমার আপনজনে এখনো তো জানা হ'ল না,
আমার নিত্য নূতন, সেই পুরাতন এখনো তো
আপন হ'ল না।"

যাঁর সঙ্গে অষ্ট প্রহরের নিবিড় মাধুর্যভরা একটা একাত্মতার সম্পর্ক হওয়ার কথা, মরমী মনীষীর ভাষায়—

"a relationship unimaginably intimate, though difficult to define and explain". তাঁর সঙ্গে ঠিক ভালবাসার সম্পর্ক কিছুমাত্রও কি বোধ করতে পেরেছি? "জগন্নাথ"—জগতের নাথকে, "মন্নাথ"—আমার নাথই তো করতে পারলাম না। ভগবান করেই তো রাখলাম তাঁকে, আমার মা-বাবার মত, বা বন্ধুর মত যার সঙ্গে গীতায় অর্জুনের কথায়, 'বিহারশয্যাসন ভোজনেষু' সব সময় কাটাই,—বসি উঠি, খাই শুই বেড়াই সেই প্রাণের সখা—আক্ষরিক অর্থেই "Bosom Friend"-এর মত ক'রে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগল না, তেমন করে পাওয়ার কথাটি ভাবতেও পারলাম না। শুধু ভক্তির পাত্র করে তাঁকে মন্ত্রতন্ত্রের পূজাই করলাম, সম্ভ্রমবোধেই তাঁর চরণে অর্ঘ্য প্রণাম নিবেদন করলাম, কিন্তু মমতাবন্ধনে সব সময়ের জন্য তাঁকে হৃদয়ে ধরে রাখতে চাইলাম কৈ?

তাই তাঁকে আমার প্রাণের অবলম্বন, জীবনমরণের সাথী করে তুলে, আমার সব শঙ্কা ও শূন্যতার অবসান করতে তো পারলাম না।—ফলে 'সেই হাহাকার রব, সেই অশ্রুবারি, হৃদয়-বেদনা' রয়েই গেল:

'আরাধনীয়'কে 'আদরণীয়' করে তুলতে হবে। ভক্তিকে প্রীতিতে রূপান্তরিত না করে হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাব কি করে? আমার তো চাই সেই শিশু ভগবানকে যিনি আমার ভালবাসার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, এবং সেই সদালীলাময় সখাটিকে—যিনি সঙ্গে থাকলে অন্য সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়,—মান অপমান, সুখ-দুঃখ, এমন কি বাঁচা-মরাও কেমন যেন হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এবং ভক্তের এই সাধ মেটানোর জন্যই তো 'ভক্তবৎসলের'—'লীলারসময়ের' নরলীলা। সেই লীলামাধুর্যের এমন স্বাদ পেয়েও কি আমরা স্বর্গের দিকে হাত জোড় করেই থাকবো? যিনি সঙ্গী হবেন সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন বলে একবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে হাত ধরে ভেতরে এনে 'ঘরের মানুষ' করে নেব না? 'বিনা প্রেমসে

না মিলে নন্দলালা'—নন্দলালা তো পূজার কাঙাল নন, তিনি চান ভালবাসা—পেতে ও দিতে।

গীতায় ভগবান কত আকুলই না হচ্ছেন মমত্ব দিয়ে যাতে তাঁকে আমরা আমাদের করে নিই সেজন্য। বলছেন "মধ্যাসক্ত" হতে, তাঁর মায়ায় বদ্ধ হতে।

"যে মায়ায় বদ্ধ আছ ভবে, সেই মায়া অর্পণ করহ মোরে :" এবং তাহলেই দেখবে সব মধুময় হয়ে উঠেছে।

"নাহি পাশ, নাহি ত্রাস,—আনন্দ-আগার ;
নিত্যসুখধাম,—পূর্ণ সর্বকাম,
অবিরাম শান্তি হৃদয়ে করে বাস।"

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

বিশ্বাসের দান

দৃষ্টি শুদ্ধ হলে দেখব মায়ের কোলে,—মায়ের সত্তাতেই মিশে সর্বদা রয়েছি। অবিশ্বাস করি বলেই তো বিড়ম্বনা। 'এই যে মা তুমি রয়েছ' এটা ঠিক ঠিক মনেপ্রাণে ধারণা হলে দেখতে পাই তুমি সত্যিই আমার মহামঙ্গলের জন্য নিয়ত উৎকণ্ঠিতা হয়ে আমার সামনেই রয়েছ। ভাবে ভাবে, ভাবিনী মা আমার হৃদয়ে নিত্যই আসছেন, ফিরছেন।

কোনরূপে এ বোধটা যদি মনে একবার স্থায়ী হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত চিত্তচাঞ্চল্য, তরঙ্গ বিক্ষেপ চিরতরে তিরোহিত হয়। সাধক-ভক্ত তখন দ্রষ্টার মত দেখে যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মন কত রং বদলাচ্ছে, কত রকম খেলা খেলে যাচ্ছে। মা আমাকে নিয়ে খেলছেন, জানলে ও বিশ্বাস করলে সব কিছুই, তথাকথিত ঝঞ্ঝাটগুলোও ভারী একটা মজার ব্যাপার মনে হবে।

বিশ্বাসের অপেক্ষা

গতকাল Easter Monday প্রতিবারের মত এবারও সেই গভীর আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেল—সত্য শিব সুন্দরের দীপ্তিমান উজ্জ্বল সূর্যটি, সমস্ত কালো মেঘ দিয়েও চেপে ডুবিয়ে দেওয়া যায় না, সব মেঘ হটিয়ে নয়নাভিরাম রূপে প্রকাশিত হয়ে সে প্রমাণ করে সে অপরাজেয়। তার শক্তি, যে প্রেমের অমোঘ শক্তি। খ্রীষ্ট-সত্য তো আসলে এই প্রেমের সত্য, তা মরে যাবে, মুছে যাবে কেমন করে?

"কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।"

তাই তো ভগবান মরমী সাধককে বলছেন, দুঃখ অশান্তির যে চোখের জল গাল বেয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে তাকে একটি দিন অন্তত ঠেকিয়ে রাখো, এরই ভেতর তাঁর প্রসন্নতার আলোতে সব ঝলমল করে উঠবে। এ আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা কর, বিশ্বাসের অপেক্ষা।

"Put off until tomorrow those tears which fill
Your eyes and your head
Flooding you, rolling down your cheeks ;
Because between now and tomorrow, may be
I—God, will have passed your way
Blessed is he who puts off—blessed is he who
hopes
And who sleeps.

এবং তখন, "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে রে ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙ্গীন হয়ে,
গোলাপ হয়ে উঠবে।"

মূলধন বিশ্বাস

জয়রামবাটীতে সুদূর শিলেট থেকে ভক্ত এসেছেন মায়ের কাছে তাঁর সাংসারিক নানা চিন্তা-ভাবনার কথা জানাতে। 'সব দুঃখের কথা কব কৈলাশেতে গিয়া', এ আকুলতা নিয়ে। মা তাঁর উদ্বেগ অশান্তির কথা দীর্ঘ সময় ধরে ধীরভাবে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে শুধু বললেন—'তা' বাবা, ঠাকুর আছেন।'

"Mother's simple words have tremendous effectiveness. They are simple, but direct : they hit the mark !"

এক্ষেত্রেও মায়ের ছোট্ট এই কথায় ভক্তটি সর্বভাবনামুক্তির যেন নিদানটি পেয়ে গেলেন, কারণ তাঁর চেতনা হল যে—'ঠাকুর আছেন, তিনি আমায় দেখছেন ; এ মহাসত্যটির বিস্মৃতির ফলেই তো আমি অশান্তি ভাবনা জর্জরিত হচ্ছি।' এবার তিনি নিশ্চিত নিরুদ্বেগ হলেন, তাঁর সব অস্থিরতা দূর হল, যেমন গীতায় অর্জুন তাঁর বিহ্বলতা কাটিয়ে স্থির হতে পেরে-

ছিলেন কৃষ্ণের কথায় তাঁর লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পেয়ে।

এই আস্তিক্য বুদ্ধিই—'তিনি আছেন' এই বোধই জীবনের ও সাধনার একমাত্র যথার্থ মূলধন। এই মূলধন যার যত বেশী আছে, সে তত বেশী লাভবান হয়।

আমি মায়ের স্বরূপ মহিমা প্রভৃতি কিছুই জানি না, মাত্র জানি—'মা আছেন'—এই কথাটাতে এমন একটা বিশ্বাস আনা চাই যে শতসহস্র আঘাত প্রতিঘাত, বিতর্ক বিরুদ্ধ প্রমাণ যতই আসুক না কেন,—মাতৃ-অস্তিত্বের আমার সেই বোধকে বিন্দুমাত্র শিথিল নিষ্প্রভ করতে পারবে না। এবং এই পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসও শুধু মাতৃকৃপাতেই সম্ভব। মন যেন সেই কৃপাভিখারী হয়।

বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা

'কথামৃতে' আছে 'শ্রীমতী' সখীদের বলছেন ঃ

"তোদের শ্যাম কথার কথা,
আমার শ্যাম প্রাণের ব্যথা।"

ঐ 'প্রাণের ব্যথা' করে তোলা 'কথার কথা' ভগবানকে,—এটাই তো ভক্তচিত্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা। He brings God from the sphere of notion to the sphere of fact !

দার্শনিক পণ্ডিতের তত্ত্বের ভগবানকে সে তার প্রাণ-সত্যে পরিণত করে জীবন মধুময় করে। সামান্য মানুষই তাতে অসামান্য হয়ে যায় এবং তখন সে পণ্ডিত ব্যক্তির অবস্থা দেখে আক্ষেপ করে—

"মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে
যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে ?
সে যে ভাবের বিষয়,—
অভাবে কি ভাব ধরতে পারে ?"

কালীতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়া ৺কালী, তার কাছে তো 'আদরিণী শ্যামা মা', যাকে সে 'যতনে হৃদয়ে রাখে।'

এই ভক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, তাঁকে জীবন-সর্বস্ব প্রাণসর্বস্ব করার আকাঙ্ক্ষাটি হয় কি করে? বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দ্বারাই,—তিনি আছেন, 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস : এবং তাঁকে চাই-ই, না হলে আমার একেবারেই চলবে না বুঝে তাঁকে পাওয়ার জন্য বুক-ফাটা ব্যাকুলতা দ্বারাই। এই 'sense of certainty' ও 'sense of urgency' এসে গেলেই বুঝতে হবে জীবনাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য উঠছে— সব অন্ধকার এবার আপনি কোথায় মিলিয়ে যাবে।

এই পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তীব্র ব্যাকুলতা আমাদের হবে কি করে? সত্যি বলতে, তাঁর জন্য মন 'উন্মুখ' যাকে বলে তা তো হয়নি, 'বিষয়বদ্ধ কামাদি কুসুম সকলে' এখনও তুচ্ছজ্ঞান হয়নি।

কিন্তু তবু মাঝে মাঝে, বিকারের ফাঁকেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে, মোচড় দিয়ে ওঠে, আর তখন আকুল হয়ে, হাঁ আকুল হয়েই বলি :

"তোমার দয়া চাহিতে
নাও বা যদি জানি—
তবু চরণে নিও গো,
নিও মোরে টানি!!"

বা ভক্ত **Isherwood**-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনা করি—

"Lord! give me devotion even against my will!"

চাই পাকা বিশ্বাস

"যে যত বড়লোকই হোক—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, গুণী, মানী, ধনী হোক না কেন, কারও চিত্তে শান্তি নেই। কিন্তু তাঁর ভক্ত হলে—তাঁর দাস, পুত্র হয়ে, যন্ত্র হয়ে সংসারে থাকলে শান্তি। কথাটা হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা,—তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে সংসারে থাকা।

গীতাতে ভগবান ডঙ্কা মেরে এই কথাই বলেছেন : "নচাভাবয়তঃ শান্তিঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখম্?"—ভগবানের চিন্তা যার নেই তার শান্তি নেই। আর যার শান্তি নেই, তার কদাপিও সুখ নেই।

এমন একটা অবস্থা মনে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত—যে অবস্থায় সাংসারিক সব অবস্থায় মনে শান্তি থাকে,—'বেশ আছি' বলা চলে না। এবং সেটি হয় ভগবানের সঙ্গে একটা জীবন্ত সম্পর্ক পাতাতে পারলে। আর এই বিশ্বাস থাকলে যে তিনি জন্মে জন্মে আমার স্নেহময়ী মাতা। যদি নিজের এই বিশ্বাস,—পাকা বিশ্বাস না থাকে, যাঁদের এ বিশ্বাস হয়েছে তাঁদের সঙ্গ করলে তোমার এই বিশ্বাস হতে পারে। তাঁদেরই বলে 'সাধু'। সংসার-মরুতে তাঁরা Oasis—মরূদ্যান।"

বিশ্বাসের দরবারে

বুঝতে হবে জীবনের চরম উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে বলেই, লক্ষ্য-হীন জীবনের অতৃপ্তি ও অস্থিরতায় আমরা নিয়ত জর্জরিত হচ্ছি।

আমাদের আত্মা জীবনের কাছে সেই আনন্দের দাবী করছে—'যে আনন্দে বচন নাহি স্ফুরে' এবং ভগবানের, সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতাতেই (এবং কেবল তাতেই) এই অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি সম্ভব। 'তোমার মাঝে মোর জীবনের সকল আনন্দ আছে।' কথাটি তো কবিত্ব মাত্র নয়। মা-হারানো শিশুকে এটা ওটা দিয়ে কি ভোলানো যায়? তাতে বরং তার অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। আর আসলে আমরা প্রত্যেকেই সেই শিশু যে মায়ের কাছ-ছাড়া হতে চায় না এক মুহূর্তেও। তার আকুল আকাঙ্ক্ষা—

"একটি প্রণাম হয়ে আমি
রইবো তোমার পায়ের কাছে;
আর কিছু নয়, পরাণ আমার—
এইটুকু যে নিত্য যাচে।"

জীবনের এই চরম রূপটিকে জানতে হলে দরবার করতে হবে শ্রদ্ধার কাছে, বিশ্বাসের কাছে, প্রেমের কাছেঃ—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—ঠাকুরমা তাঁদের শিশুকে সেই সংশয়-রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচান।

আলোকের ঝর্ণাধারা

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবনাঞ্জলি—৫

জীবন্মুক্তি

সংসারের সব কিছুকে লঘু করার শক্তি দেয় মৃত্যুচিন্তা। মৃত্যুর চির-বর্তমান সত্যটি ভুলে থাকি, ভুলে থাকতে চাই বলেই এসব নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। Whistle বেজে উঠলেই ট্রেনটা হুস্ করে যেখান থেকে চলে যাবে সেখানকার ব্যাপারগুলো নিয়ে এত মাথা ঘামানোর, অত মাথাব্যথার কি আছে? মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয় এ সংসার-জীবন ভোজবাজি, সিনেমার পর্দার ছায়াছবি,—একেবারেই ফক্কা, 'সং'ই সার। 'Life is but a walking shadow !' ম্যাক্‌বেথ যেমন বলেছিল। এর সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব এত দিই বলেই তো তারা 'গুরুতর' হয়ে উঠে আমাকে নাজেহাল করে ছাড়ে। 'আমি নেই' হলেই যখন এসব কিছুই নেই হয়ে যাবে, তখন এসব নিয়ে উদ্বেগ-ভাবনার বাড়াবাড়ি হলে, যেন আমি নেই ভাবলেই তো যে বন্যা আমাকে ভাসিয়ে নেবে, ডুবিয়ে দেবে, এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তা মুহূর্তে সরে মিলিয়ে যাবে। একজন মনীষী যে 'philosophy of as if' practise করার উপদেশ দিয়েছেন এ তাই। যেন মরে গিয়েছি—'as if, I am dead !' ভাবলেই সব ভাবনার ইতি হয়ে যায় ও নিজের সহজ সত্যরূপ লাভ করি। মৃত্যুর আয়নাতেই জীবনের সত্যরূপটি প্রতিফলিত হয়, মেকীকে হটিয়ে খাঁটিকে সে সামনে এনে দেয়! তাই সে আয়নার সামনে মাঝে মাঝেই ঘুরে দাঁড়াতে হবে, তাহলেই সংসাররূপ ভূতের রাজত্ব আমিত্বের উপদ্রব সব পেছনে পড়ে যাবে। বলে না 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' নিষ্ফল। তাই তো ঠাকুর ভক্তদের, 'জ্যান্তে মরা' হতে বলেছেন, এবং অন্য অবতারেও 'Be dead to the world !' এই নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক ঠিক 'জীবন্মৃত' হতে পারলেই 'জীবন্মুক্তি'র আনন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হবে।

"মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তারপরেতে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।"

মৃত্যুরূপা মা

১

"শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি—
ও ভাই গৃহস্থ চাষী, ছেড়ে আয় বাড়ী।
ভিজিয়া নরম হ'ল শুষ্ক মরু-মন,
এই বেলা শস্য তোর করেনে বপন।"

২

দুঃখ সাধারণ, শোক ব্যক্তিগত :—
যাহা ছিল ঘটনা মাত্র, তাহা হইয়া উঠিয়াছে বেদনা!

৩

মাতা ও মৃত্যুর স্বচ্ছ মহামিলন হয়েছে ভীষণ-মধুর কালীরূপে, যেটি আমাদের মা-সারদার যে আসল স্বরূপ তার বহু ইঙ্গিত ঠাকুর ও মায়ের নানা কথায় তো রয়েছে। তাই তো স্বামীজী মা কালীকে 'মৃত্যুরূপা মাতা!' সম্বোধন করেছেন।

যদি ভয়াবহ মৃত্যুকে স্নেহময়ী জননীরূপে ধ্যান করা যায় এবং যদি এই ধ্যানের উপলব্ধিকে জীবনের সত্য করে তোলা সম্ভব হয়, তবে এক খড়্গাঘাতে মৃত্যুর ভয়াবহতার পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুকে মাতৃপদ দান করে স্বামীজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শিশুর আহ্লাদে বলা যায়—'মৃত্যুরূপা মা আমার। আয়!'

জয় মা!

প্রার্থনা

তাঁর কাছে প্রাণের আর্তি জানিয়ে নিরন্তর প্রার্থনা করতে বলেছেন ঠাকুর, মা ও তাঁদের পার্ষদেরা। অধ্যাত্মপথের পথিকের প্রার্থনাই তো বল, সম্বল, ভরসা। 'বালানাম্ রোদনম্ বলম্'। প্রার্থনায় যার পাঁচসিকে পাঁচ

আনা বিশ্বাস,—যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে ঠিক ঠিক অন্তরের প্রার্থনা তিনি শুনবেনই শুনবেন, তার অভিধানে—গান্ধীজীর ভাষায়, 'ব্যর্থতা', 'পরাজয়' কথাগুলি নেই। অবতীর্ণ পরমেশ্বরের কী মধুর আশ্বাস : 'তিনি বড় কানখড়কে গো, যত ডেকেছে সব শুনেছেন'। কথামৃতে অন্তত চল্লিশ জায়গায় প্রার্থনা—সরল ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁকে পাবার উপায় বলে ঠাকুর নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রার্থনার মাধ্যমেই তো তাঁর সঙ্গে মননে, ধ্যানে যুক্ত হতে হবে। যে 'নিত্যযুক্ত' ভক্তের সমস্ত ভারটি নেবেন বলে গীতায় পরমপুরুষ আশ্বাস দিচ্ছেন, প্রার্থনা তার শ্বাস-প্রশ্বাসের মত হয়ে গেছে। 'শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করো।'—

ঠাকুর ভক্ত-সন্তানদের শুধু প্রার্থনা করতেই বলছেন না, মা যেমন তাঁর শিশুকে কোলে বসিয়ে মুখে মুখে ছড়া শেখান, তেমনি করে ঠাকুর কি প্রার্থনা করব তা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন।—

প্রথম—"ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর যাতে তাঁর নামে রুচি হয়।" (ক—২য় ভাগ) [এটিই প্রথম কথা—"নামে রুচি।" খ্রীষ্ট-নির্দিষ্ট প্রার্থনার প্রথম বাক্যটি,

—তোমার নামের মধুস্পর্শে
আমার অন্তর পবিত্র স্নিগ্ধ মধুর হোক।

দ্বিতীয়—"তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর যাতে অনুকূল হাওয়া বয়, যাতে শুভযোগ ঘটে।" (ক—৩য় ভাগ)

তৃতীয়—আর "সরলভাবে বলো : হে ঈশ্বর, কামিনী কাঞ্চন থেকে মন তফাৎ করো।" (ক—৫ম ভাগ)

চতুর্থ—আবার বলেছেন : "যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে, তেমনি ওটাও বলবে—'যেন কারু নিন্দা না করি'। মায়ের ভাষায় প্রার্থনাটি হল : 'আমার দোষ-দৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও।' মা বলেছেন, 'দোষ দেখতে দেখতে মনটা দূষিত হয়ে যায়'।"

তাহলে সার্থক প্রার্থনা করতে হলে চাই পাঁচটি জিনিস। প্রার্থনার এই পঞ্চশীল হল—সরলতা, বিশ্বাস, অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও বিদ্বেষহীন মৈত্রী সর্বজনের প্রতি।

স্বরকে সুরে পরিণত করার মতই, প্রার্থনার 'মুখস্থ' কথাকে 'অন্তস্থ' করা, মুখের ডাকটিকে বুকের ডাক করা দীর্ঘ ঐকান্তিক চেষ্টাসাপেক্ষ। এটি না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থনার ফলের জন্য অধীর হলে চলবে কেন? বরং এ সাধনা যাতে ঠিক হয় সে চেষ্টাই তো মনে প্রাণে করতে হবে। পাওয়া তো শক্ত নয়, চাওয়াই শক্ত—ঠিক জিনিস চাওয়া, এবং তা ঠিকভাবে চাওয়া। আসলে মন এখনও তো 'লাউ-কুমড়োর' খদ্দের। ঠিক জিনিসটি সত্যি চাই না, তাই সে চাওয়াটা প্রাণের চাওয়া হয় না। তাই কাতর হয়ে বলতে হয়—

"চাহিতে নাহি যদি জানি,
তবু চরণে নিয়ো গো, নিয়ো মোরে টানি।'

বুঝতে হবে প্রার্থনা করাও তাঁর কৃপা-সাপেক্ষ।

অক্ষয় তৃতীয়া ও মাতৃপীঠের প্রতিষ্ঠা

পুরাণের সমুদ্রমন্থনে যেদিন নানা অঘটনের পর অমৃতভাণ্ডটি উঠেছিল এবং যাঁরা সেটি লাভ করলেন তাঁদের জীবনে অক্ষয় সুখ শান্তি ও আনন্দের স্বর্গ উজ্জ্বল বিভায় প্রকাশিত হয়ে তাঁদের অমর দেবশিশুতে রূপান্তরিত করল। অর্থাৎ শাপমোচনান্তে তাঁরা তাঁদের যথার্থ রূপ,—স্বরূপটি ফিরে পেলেন, সেদিন সব অসত্য থেকে এক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা "সত্যযুগে" প্রবেশ করলেন। সংসারের অন্ধকারের নানা বিভীষিকার ভেতর দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেদিন ভগবৎ প্রেমের অমৃত স্বাদ আমরা লাভ করি, অখণ্ড চৈতন্যের আনন্দ-লোকটি আমাদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়, সেদিন আমরাও অক্ষয় প্রশান্তি ও দৈব আনন্দের স্বর্গে প্রবেশ করি—কলিযুগের কলুষ কাটিয়ে 'সত্যযুগের' মানুষ হয়ে যাই। 'অক্ষয় তৃতীয়া'—সমুদ্র-মন্থনে অমৃত আবিষ্কারের এবং 'সত্যযুগারম্ভের পুণ্যতিথি যে বলা হয়, এটিই তার আসল তাৎপর্য। চৈতন্যের এই আনন্দলোক—জগজ্জননীর স্নেহক্রোড়টি তো উদ্ভাসিত হয়' The Third Eye—eye of intuition বা

প্রজ্ঞার 'তৃতীয় নয়নে', তাই অক্ষয় তৃতীয়া সেই নির্দিষ্ট তিথি। জীবনে জগতের মাঝে এনে জীবন-রূপ তুদিনের আবাসটিকে শাশ্বত সত্যের মন্দিরে রূপান্তরিত করে সে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা এই বিশিষ্ট তিথিতেই হয়। তাই 'অক্ষয় তৃতীয়া' বিশেষভাবে গৃহপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্বের ভিত্তিতে এই 'আশ্রয়গুলিকে' প্রতিষ্ঠার শুভতিথি, এই বিশিষ্ট তিথিতে ১৯২৩ সালে জয়রামবাটীর মাতৃপীঠে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার স্মরণে আজ সেখানে কত না আনন্দোৎসব হচ্ছে, আজ আমরা যেন সত্যভাবে এটিকে নিজ নিজ জীবনের উৎসবেরই প্রতীক বলে মনে করতে পারি, আমাদের হৃদয়-মাতৃপীঠেও সুন্দর একটি মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটা উপলব্ধি করে—সে সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয়িত হই। তখন আমরা স্বামীজীর বাণীর প্রতিধ্বনি করে বলতে পারব, 'ঠাকুর-মায়ের আবির্ভাবে জগতে (তাঁর জনদের জগতে) সত্যযুগ এসেছে'।

জয় মা : জয় ঠাকুর।

গুরোঃ পরতরং নাস্তি

কাল গুরুপূর্ণিমা। তাই 'আজি এ প্রভাতে', স্বভাবতই পরমপ্রেম-স্বরূপের গুরুরূপ, গুরুভাব ও গুরুশক্তির অনুধ্যানে মন মগ্ন। অজ্ঞানতার মোহে অভিভূত জীবের অশেষ ক্লেশ যাতনায় বিচলিত ব্যথিত হয়ে সহস্র করুণাধারায় যখন তিনি নেমে আসেন এবং কোন শুদ্ধ হৃদয়ের মাধ্যমে শুষ্ক-প্রায় জীবনকে সঞ্জীবিত করে তোলেন ফুলে-ফলে সেটিকে ভরিয়ে দেবার জন্য, তখনই তাঁর গুরুভাব, গুরুশক্তি ও গুরুরূপের অভিব্যক্তি দ্বারা নিজ নিজ জীবনে তাঁর অশেষ প্রেম ও করুণার স্পর্শলাভে আমরা ধন্য হই।

আষাঢ়ী পূর্ণিমাটি যে 'গুরুপূর্ণিমা' রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে এটি বিশেষ তাৎপর্যময়। কারণ আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা ও ভরা জ্যোৎস্নার রাতের ফলে যেমন তমসার লেশমাত্র এদিন থাকে না, তেমনি সর্বক্ষণই চলছে বর্ষণের

স্নিগ্ধ বারিধারা যা শুষ্কতা দূর করে দিয়ে সব কিছু স্নিগ্ধ সরস করে দিচ্ছে। আমরা ভুলে যাই সকল অপূর্ণতা ঘুচিয়ে পূর্ণতা লাভের জন্য (পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যে পূর্ণতারই প্রতীক) জ্ঞানের আলোই যথেষ্ট নয় হৃদয়ের সরসতাও চাই এবং সেইটি তাঁর কৃপার অজস্রবর্ষণই শুধু সম্ভব করে। এটি না হলে শুধু 'জ্ঞানের আলো', অহং-অভিমানের উত্তাপ-বৃদ্ধিও করতে পারে। গুরু 'জ্ঞানদাতা' মাত্র তো নন, তিনি ভগবৎকৃপাবর্ষী সজল-শ্যামল করুণাঘন মেঘ। গুরুলাভে হৃদয়াকাশে কৃপামেঘের সঞ্চার হয়েছে, তার স্নিগ্ধছায়া সব তাপক্লান্তি দূর করে দিচ্ছে, জীবনজমি এবার সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে, মনে সেই রোমাঞ্চকর আশ্বাস জাগাচ্ছে।

শ্রীগুরু নিত্যসত্যরূপে বর্তমান, শিষ্যের সমগ্র জীবনেই তিনি ব্যেপে রয়েছেন, এটি মনে রাখতে হবে। ভক্ত Isherwood সেই কথাই স্মরণ করে বলছেন—"I may be poisoned with hatred and half-mad, but nevertheless I am his disciple ; he choose me for his disciple, and he can never desert me. I know he is always with me, even if I do not feel his presence. And so long as I accept this fact of facts, what can I possibly fear ?"

শ্রীম—ভক্তপ্রবর

কাল নাগপঞ্চমী—'মাস্টার মশায়ের' জন্মতিথি : একটি ভক্তিধন্য জীবনের পুণ্যপ্রকাশ ঘটেছিল এই বিশিষ্ট তিথিতে, ১৮৫৪ সালের ১৪ই জুলাই।

শ্রীম'র জীবনটি ভক্তের আদর্শ। "Ramakrishna-centred, Ramakrishna-circumferenced, Ramakrishna-soaked life-এর একেবারে নিখুঁত একটি Model. "Ramakrishna-soaked"-ই বটে : ঠাকুর যে 'ডাইলিউট' (dilute) হয়ে যাওয়ার কথা বলতেন, মাস্টারমশায় রামকৃষ্ণ-প্রেমসমুদ্রে সেই 'dilute' হয়ে

গিয়েছিলেন, গলে একেবারে মিশে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর পৃথক সত্তা বলতে এতটুকু কিছু ছিল না। তাঁর জীবনকথা জানতে চাইলে 'শ্রীম' বলতেন—"ঠাকুরের সঙ্গে যেটুকুর সম্বন্ধ সেটাই Real life, আর সব Rubbish।"

'কথামৃতে'ও শ্রীম আছেন শুধু চোখ আর কান হয়ে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রাণভরে শুধু দেখতে চান, আর উৎকর্ণ হয়ে ঠাকুরের অমৃতক্ষরা প্রতিটি কথা শুনতে চান—কানের ভেতর দিয়ে সেই বাণী মরমে নিয়ে যেতে চান। কারণ তিনি প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন চিরকালের বর্তমান,—"Everlasting Now",—ঈশ্বর অবতারের কাছে। তারপর?—ধ্যান! ধ্যান! ধ্যানই তাঁর জীবন। গৃহী তিনি, ঠাকুর তাঁকে ঘরছাড়া করেননি, কিন্তু 'সংসার-বাতায়নপথে' সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে, তিনি দীর্ঘ জীবনভরে অনিমেষ নয়নে দেখেছেন তো শুধু তাঁর প্রাণারাম শ্রীরামকৃষ্ণকে। এবং তাই তো ৪ঠা জুন, ১৯৩২-এর ফলহারিণী কালীপূজার মহানিশায়—'মাগো—ঠাকুর, আমায় কোলে তুলে নাও'—বলে ঠাকুর-মায়ের জোড়াকোলে ঘুমিয়ে পড়লেন রামকৃষ্ণসারদাগত-প্রাণ শিশু 'শ্রীম'—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কী ঈর্ষা করার মত না এই জীবনটি, ভাবতে গিয়ে চোখে জল আসে।

বিশ্বাসের মূর্তপ্রতীক—শশী মহারাজ

আজ পূজনীয় শশী মহারাজের জন্মতিথি,—'রামকৃষ্ণ পঞ্জিকার' পাতার একটি বিশিষ্ট দিন। রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণতা, পরাকাষ্ঠা ও নিঃসীম গহনতা লাভ করেছিল শশী মহারাজের জীবন। সেই জন্য 'রামকৃষ্ণানন্দ',—এই অভিধাটি তাঁর জন্যই স্বামীজী নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "ওই নামটি আমার নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভেবে দেখলাম, ওই নামটির ওপর শশীর দাবীই বেশী", Sasi has a greater claim to it। 'বাপ্‌রে'!—রামকৃষ্ণ-ভক্তিতে স্বয়ং বিবেকানন্দকে যে

মানুষটির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, কী বিস্ময়কর মানুষই না সেই রামকৃষ্ণানন্দে রূপান্তরিত শশী মহারাজ।

বরানগর আদিমঠের ভাঙ্গাবাড়ীতে রামকৃষ্ণ-অর্চনাকে ধ্যানজ্ঞান করে শশী বিভোর রইলেন, অনশনের অর্ধাশনের সেই দিনগুলিতে। মজা করে ঠাকুর যে তাঁর নিজের কথায় 'ও ঘরে' চলে গিয়েছিলেন সেই শ্রাবণের মহানিশার অন্ধকারে, শশীর ভক্তির টানে, তাঁকে ফের 'এ ঘরে'ই এসে অনাগতকালের জন্য ভক্তদের সাথে লীলারত হয়ে থাকতে হল। আজ যে 'ঘর ঘর' ঠাকুরের পূজা সম্ভব হয়েছে তার মূলে তো শশী মহারাজ, সে হিসাবে মঠও তো তাঁরই সৃষ্টি। গুরু-ভাইরা যখন তপস্যা করতে হিমালয়ে চলে গেলেন তখনও বরানগরের সেই 'ভূতুড়ে বাড়ীর' ভাঙ্গা ঘরে প্রভুর সেবা নিয়ে একাকী মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন তিনি। রামকিংকর হনুমানের মত বুক চিরে যেন তার মধ্যে রেখে দিয়েছেন তাঁর ঠাকুরের বিমোহন মূর্তি। কী জ্বলন্ত বিশ্বাস! কী একান্ত সান্নিধ্যবোধের নিবিড়তা!

ভক্তকে বলছেন শশী মহারাজ, 'ঠাকুর আছেন, এবং আমি তাঁর জন্য —এ মহা সত্যটিকে অবিশ্বাস-সংশয়ের কালো মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে জেনো, যখনই মনটি চিন্তা-ব্যাকুলিত হয়ে উঠছে'।

বিশ্বাসের মূর্ত-বিগ্রহ শশী মহারাজ ভক্তমাত্রকেই একথা ভগ্নী দেবমাতার মাধ্যমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

"When anxiety arises in you, you become on atheist,—
You cease to believe in God and that He cares for you !!"

আজকের তাঁর পুণ্য জন্মতিথিতে আমাদের প্রার্থনা, জ্বলন্ত রামকৃষ্ণ-ভক্তির অপরূপ উদাহরণ এ জীবনটির একটি দিনের অনুধ্যানেও সেই ভক্তিবিশ্বাসের তেজে যেন একটু অন্তত উদ্দীপ্ত হয় আমাদের নিষ্প্রভ হৃদয়।

'পুঁথিকার' যথার্থ বলেছেন :

"শশীর মাহাত্ম্য—কথা কি কহিতে পারি
সেবা-ভক্তি ভাণ্ডারের একক ভাণ্ডারী॥
সেবা ভক্তি শ্রীপ্রভুর যাহার কামনা।
সে পারে যত্মপি করে শশীর সাধনা॥"

জয় মা : জয় ঠাকুর।

গিরিশ-ভক্ত ভৈরব

প্রেমময় ঠাকুরের দুর্নিবার আকর্ষণের রূপটি গিরিশ ফুটিয়েছেন তাঁর 'রূপ-সনাতন' নাটকের একটি গানে এবং অন্য ভক্তিনাট্যগুলিতেও—যেমন 'শান্তি, কি শান্তি' 'কালাপাহাড়' ইত্যাদিতে, ভাবময় সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকুল অনুরাগ।

'"কে বলে" আয়রে তনয়, আয়রে কোলে
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি।
কেন পান্থবাসে, এসো আবাসে
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা
জ্বালা সবে না হৃদিকমলে।'

"'শান্তি, কি শান্তি' নাটকের এই গানে গিরিশ অভিভূত হৃদয়ে স্মরণ করছেন সেই মাতৃসম সন্তানবৎসল ঠাকুরকে যিনি গিরিশের দুঃখবেদনায় ব্যথিত বিচলিত হয়ে, 'তোমার জ্বালা আমায় দাও, তোমার জ্বালা আমায় দাও।'—" বলে তাঁর সব জ্বালা-যন্ত্রণা নিজের বুকে টেনে নেওয়ার জন্য কাতর হয়েছিলেন।

ঠাকুরের টানে পড়ে কি হয়, তারই প্রকাশ হয়েছে 'রূপ-সনাতন' নাটকের এই সঙ্গীতের ছত্রে—

"যখন আসবে তুফান, ভাসিয়ে নে' যাবে।
সে যে অকূল পাথার, নাইক সাঁতার—

কূল-কিনারা কে পাবে ?”

প্রসিদ্ধ ‘কালাপাহাড়’ নাটকের গানে এই ‘আসার’ রহস্যটি উদ্ঘাটন করছেন গিরিশ—

“আসে যদি আপনি আসে
কোমল হৃদি ভালবাসে,
বসলে পরে হৃদয় মাঝে
আর তো যাবে না।
আপন হয়ে ফেলে ফাঁদে
হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
দিনে-রেতে মাতায় মেতে—
মান তো রাখে না!
বোঝা যায় মজে,
মেলে আপন-হারা হলে,
বুঝে জানলে জানে না!!”

গিরিশ স্বরচিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ কবিতাতেও এই কথাই বলেছেন ঃ

“কৃপাময় তাঁহারই কৃপায়
চিনেছি তো তাঁয়—
প্রাণ সঁপেছি তাইতে, ওই রাঙা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয়ভরে,
শরণ নিলেও রাঙা পায়
কলঙ্ক কোথায় পালায়॥”

বুদ্ধ—নবরূপে

করুণাঘন অমিতাভ-বুদ্ধ তো মূর্তিমান প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণেরই পূর্বরূপ। নিবেদিতা লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বুদ্ধকে পেয়েছিলেন বলেই বুদ্ধ-চরিত্র স্বামীজীর কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল এবং বুদ্ধের প্রেম ও করুণার কথা বলতেন তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উচ্ছ্বসিত আবেগ ও উৎসাহে, সর্বাবগাহী প্রেমে বুদ্ধহৃদয় পরিপূর্ণ ছিল—‘উর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে সমগ্র জগতের প্রতি কৃত্রিমতা ও পক্ষপাতশূন্য অসীম ভালবাসার ধারা চিত্তে

অবিরাম প্রবাহিত হোক।' এই নির্দেশই বুদ্ধ দিয়েছেন তাঁর প্রসিদ্ধ রাজগৃহের ভাষণে (Rajgir Sermon···), সেই বিশাল সহানুভূতি ও শর্তহীন ভালবাসার পরিপূর্ণ উজ্জ্বল নবরূপ ফুটে উঠেছে রামকৃষ্ণজীবনে —যাঁর দীন অকিঞ্চনের প্রতি অতুলনীয় 'intense sympathy'র কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বিহ্বল হয়ে যেতেন। নিবেদিতা বলছেন, যে জগৎ থেকে তুচ্ছতম মলিনতম মানুষচিত্ত বাদ পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে সে জগৎ অপূর্ণ। অঙ্গহানিতে শ্রীহীন। মুগ্ধ বিস্ময়ে নিবেদিতা শ্রীরাম-কৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বমাতৃত্বের বিমোহন মূর্তিই প্রত্যক্ষ করেছেন। বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার কথায় বলেছেন, 'মা তাঁর একমাত্র সন্তানকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে রকম ভালবাসেন, সেই রকম ভালবাসা সর্বজীবে প্রসারিত করতে। এরই জ্বলজ্বলে উদাহরণ 'চির উন্মাদ প্রেম পাথার'—শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য পরার্থ নিবেদিত জীবন।

সারনাথের প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দিরে বেদীতলে নতজানু হয়ে ব্রহ্মদেশাগতা জনৈকা মহিলা (যিনি একধারে নিষ্ঠাবতী বৌদ্ধ ও পরম রামকৃষ্ণভক্ত) কী সুন্দর বলেছিলেন—

"Lord! I take refuge in Ramakrishna
—your latest and freshest incarnation!"

বুদ্ধপূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় বুদ্ধভক্ত বিদেশিনী মহিলাটির সুন্দর কথাতেই বুদ্ধচরণে তোমাদের প্রণতি নিবেদন সার্থক হোক।

প্রেমের ঠাকুর 'কৃষ্ণ'

পুনরায় শ্রাবণী-কৃষ্ণা অষ্টমী ঘুরিয়া আসিল—'জন্মাষ্টমী : ভারতপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব তিথি'। তমসাচ্ছন্ন রজনীর দুর্যোগের ঘনঘটা অগ্রাহ্য করিবার রূপকের মাধ্যমে ভারত সংস্কৃতির ঘনায়মান সংকট, পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিক অন্ধকার দূর করিবার নিশ্চিত সম্ভাবনা লইয়া দেবকীর কোলে তিমিরান্তক শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রমার উদয় হইল।

এবং শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণজীবনের বহুমুখ দুষ্কর ব্রত সংসাধন করিবার ব্যাপৃতি আরম্ভ হইল। খেলাচ্ছলে কত দুষ্টকে শাসন, কত বিপন্নকে সহায়তা দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, দীন অবজ্ঞাতদের ভালবাসিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের দুর্নিবার শক্তির বিজয় ঘোষণা।

'বাল-গোপাল' কৃষ্ণ, বালক কৃষ্ণ ও চিরকিশোর কৃষ্ণ লীলামধুর, আনন্দ বিগ্রহ। ভারত-প্রাণের শাশ্বত স্নেহপুত্তলী কৃষ্ণ বংশীধারী বনমালী।

আদর্শ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিতে হইলে, স্বামীজীর কথায়, আমাদের গীতার স্তর হইতেও একটু উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। কারণ স্বামীজীর ভাষায়—দর্শনশাস্ত্র শিরোমণি গীতা পর্যন্ত (বৃন্দাবনলীলার) সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না।

কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই 'গোপীপ্রেম' শিক্ষা দেওয়া।...তখন, সে অবস্থায়, সংসারের আর কিছু মনে থাকে না। ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তাঁহার সমগ্র সত্তা তখন কৃষ্ণের রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়।

মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। তিনি প্রেম, শুধু প্রেম, কেবলই প্রেম—সেই ধন্য ভক্তের অনুরাগ-রঞ্জিত সত্যদৃষ্টিতে।

এই কৃষ্ণকেই তো আমরা এবার পেয়েছি মাধুর্যাধিপতি রামকৃষ্ণ রূপে—'Love personified' বা 'জমাট ভালোবাসার' মূর্তিতে—'চির-উন্মদ-প্রেম পাথার রূপে'।

আর তাই তো তাঁর মানসপুত্র : 'রাখাল'—বালক-সখা সেই প্রেম-পাথারে লীন হওয়ার অন্তিম-মুহূর্তে ভাববিভোর নির্দেশবাক্য উচ্চারণ করলেন,—" 'রামকৃষ্ণের' 'কৃষ্ণ'টি চাই "।

জয় রাধাকৃষ্ণ : জয় সারদা রামকৃষ্ণ।

বাড়ীর ঠাকুরঘরটিই হচ্ছে আমাদের আশ্রয়স্থল, উদ্দীপনার উৎস-মুখ, সর্বাভীষ্ট সিদ্ধির মহাশক্তিপীঠ। এটি না হলে যে ভীষণ শূন্যতাবোধ নিরন্তর হতে থাকে তাতে গৃহ অরণ্যে পরিণত হয় ভক্তজনের কাছে। 'গতি-ভর্তা-নিবাসঃ-শরণং-সুহৃদ,'—আমার প্রাণের ঠাকুরের জন্য বাড়ীর কোন একটি ঘরও নেই, বাড়ীর সবটাই আমাদের দিয়ে ঠাসা সে বাড়ী 'আবাস' হবে কি করে? সে অন্ধকূপে কি এক মুহূর্তও মন টিকতে পারে?

'ঠাকুরঘর', বাড়ীর এই কেন্দ্রবিন্দুটি হলেই শূন্যতার অস্বস্তি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয় পূর্ণতার পরিতৃপ্তিতে। তিনি আমার কাছে আর মন্দিরের ঠাকুর নন, ঘরের মানুষ—যিনি একেবারে আমাদের মধ্যে এসেছেন এবং থাকবেন, সর্বক্ষণ থাকবেন বলে। এতে ভারী একটা ভরসা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে—অন্তত মোটামুটি বাস করতে পারি। কারণ দ্বিধায় দ্বন্দ্বে, বেদনায়, অপমানে, শঙ্কায় কুহকে ঠাকুরঘরে এসে ঠাকুর-মাকে সব কথা বলতে পারি। চোখের জলে সব ব্যথার ভার তাঁদের চরণতলে সমর্পণ করতে পারি তো ভালই, নইলে নিরস কর্কশভাবেও অভিমানের দুটো কথা তাঁদের শুনিয়ে দিতে পারি সেখানে গিয়ে।

"সম্মুখে পেয়েছি এবে সব দুঃখ কব।
মার ছেলে কেন এতেক সহিব?
কি বিচার মা তোমার বুঝিবারে নারি।
কোন ছেলে কোলে, কেহ ভূমে গড়াগড়ি॥
অমাতার ব্যবহার দেখে কত সই।
কবে দিনু মুখুয্যের পাকা ধানে মই?" (পুঁথি)

আহা! অভিমানে আগুন হয়ে ঝগড়া করতে এসে মায়ের সোহাগে সব রাগ জুড়িয়ে যায় যে জায়গাটিতে এলে, বাড়ীতে সে জায়গাটি না থাকলে কি হত, বেদনায় অপমানে যেতুম কোথায়?

সত্যি, কী ভরসার স্থল, আনন্দ উৎসাহের ভাণ্ডার বাড়ীর এই

ঠাকুরঘরটি, যদি হৃদয়ের প্রেমরত্ন সিংহাসনে সেখানে ঠাকুর-মাকে বসাতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভক্ত লেখক Isherwood লিখছেন: "It is the Shrine that really matters. You feel so safe there and there is such a sense of contact! As long as some contact is maintained with this Shrine which is always with us, all is simple and easy. But as soon as that contact is broken, all is horrible, tense & confused." ভক্তের ঠাকুরঘরে পটে ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে, এবং তখন ছায়া কায়া এক হয়ে যায় মা বলেছেন,—মা দেখেছেন আর হবে না? 'ভক্তির জোরে সব হয়'—বলে গেছেন ঠাকুর নিজে। ঠাকুর আরও বলেছেন, 'যেখানে তাঁর কথা হয়, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়।'

যেখানে তাঁর কথা হয় সেখানে যদি তাঁর আবির্ভাব হয় আর ভক্তির প্রাণের আর্তিতে ছায়া কায়া যদি এক হয়ে যায়, তাহলে আর বাকী রইল কি? চাই শুধু বিশ্বাস ও আন্তরিকতা। 'ভাগ্যশালী' বহুতল, উপকরণ প্রাচুর্যেভরা বাড়ীর মালিক জানে না সে কত দুর্ভাগা, একটা ঘরের অভাবে সারা বাড়ীটা নিঃসঙ্গ পুরীর মত খাঁ খাঁ করছে।

"যতই গৃহ সাজাই সযতনে,
তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা যেন রয় মনে।"

তাই মস্ত আনন্দ সংবাদ এটি যে বাড়ীতে ঠাকুরের ঘর হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এভাবে এটি হওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না—মনেপ্রাণে আনতে হবে এতে সারা বাড়ীটাই ঠাকুরের বাড়ী হল—মালিকানা হস্তান্তরিত হল, এটা একটা ঠাট্টার কথা নয়। কথাটি মনে গেঁথে রাখা দরকার। ঢাকার জনৈক ভক্তের গৃহে মহাপুরুষ মহারাজ গিয়ে সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে তো সে কথাই তাঁকে বলেছিলেন,—'এটা গরীবের বাড়ী নয় রে, ঠাকুরের বাড়ী, জানলি।'

আসল আমির সন্ধানে

কাল সারাটা দিন মঠে, কিছুক্ষণ মন্দিরে আর বাকী সময়টা গঙ্গার ধারের বহুপুণ্যস্মৃতিবিজড়িত Visitor's Room-এর নির্জন নিস্তব্ধ প্রকোষ্ঠে কাটিয়ে বড় ভাল লাগছিল। 'স্নানযাত্রা' যথার্থভাবে উদ্‌যাপিত হলে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত আমিটি সরে গিয়ে আসল আমিটি, যে আমি 'eternal babe of the Eternal Mother'—'চিরকালের মায়ের চিরশিশু' তার আবির্ভাব অন্তত তার কিছুটা আভাস যেন ঘটে এবং ঘটেছিল।

"পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরী সিন্ধু তীরে,
আমার অতীত সে আমি রে—
যে আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোব কোণে।"

হাঁ, অতল মাধুরী সিন্ধুতীরই বটে, যার হাওয়া লাগলে মানুষ গলে যায়, ঝানু সংসারী-মানুষও শিশু হয়ে যায়, না হয়ে পারে না। কারণ নির্বিচার ভালবাসার অনন্ত সিন্ধু, আমার "অহং"-এর সব দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়ে যেন একেবারে টেনে নেয় এবং মাতৃসিন্ধুর বুকে ছোট্ট একটি ঢেউ হয়ে খেলে খেলে বেড়াচ্ছি মনে হয়। এই জন্যই কি পুরীতে সমুদ্রে স্নান করতে নামলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না? নিবেদিতা বড় সুন্দর বলেছেন যে— "মা" মাতৃত্বের সেই বিরাট মহনীয় মহাকাব্য, গর্ভধারিণী মায়েরা যার এক একটি সুন্দর ছত্র—'The grand epic of Motherhood of which each earthly Mother is a beautiful stanza!' এসব ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতরও অদ্ভুতভাবে একটি বাৎসল্য-রসের সঞ্চার অনুভব করছিলাম, যার ফলে একান্ত স্নেহভাজনদের কথা মনে না করে পারছিলাম না। যাই হোক সব মিলিয়ে দিনটি একেবারে নিটোল আনন্দের একটি দিন হয়েছিল।

কাছে থেকেও দূরে

অতি নৈকট্য সত্ত্বেও যে অপ্রাপ্তি, তা' সত্যি বড় আক্ষেপের, বড়ই অস্বস্তিকর। তিনি শুধু যে আছেন তা' নয়, আপনতম জন হয়ে আমার পাশটিতেই তো এসে রয়েছেন, মনের মধ্যে বাসা বেঁধে 'পড়শী' হয়েছেন আমার, এ আনন্দ-সংবাদটি আমার চেতনায় অহরহ ধ্বনিত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপের জন্য যে উৎসুক-ব্যাকুল হচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে দেখতে, ধরতে ছুঁতে পারছি না। পাশে এসে একি লুকোচুরি খেলা তাঁর ?

তাই তো ক্ষ্যাপা বাউলের কণ্ঠে প্রাণের আক্ষেপ :

"আমার মনের মাঝে 'আরশি-নগর',
পড়শী বসত করে।
একদিনও তো দেখলাম না তারে !
সে পড়শী যদি আমায় ছুঁতো
সব যাতনা দূরে যেতো।
'সে' আর 'লালন' একখানে রয়,—
তবু লক্ষ যোজন দূর।
তারে যে দেখেছে
সেই মজেছে,
ছাই দিয়ে সংসারে !
বাজে বাঁশি, প্রাণ উদাসী
আমি হাঁটি আর হাঁটি।
আমি হাঁটি দূর আর দূর,—
তবে শুনি সমান সুর।
কোনখানে তুই যাবি পাগল ?
সবই সাঁইয়ের পুর।"

জীবন যখন শুকায়ে যায়

সংসারে যাঁদের বিভব-সম্পদ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রাচুর্য অঢেল, তাঁরা খুব সুখী মানুষ বলে গণ্য হন। মনে হয়, ভাগ্যদেবীর বরপুত্র তাঁরা, মানুষের যা কিছু কাম্য সব কিছুরই অধিকারী হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু হায়! এই সংসারের 'সব' পেতে গিয়ে তাঁরা ভগবানকে হারিয়েছেন এবং তাইতে তাঁদের জীবন জলহীন মরুভূমির মত রুক্ষ; বিকট একটা শূন্যতা যেন সদাই সেখানে খাঁ খাঁ করছে, নিরন্ধ্র অন্ধকারের কারাগারে আবদ্ধ প্রাণের হতাশ্বাসে, তার তপ্ত আকাশ বাতাস শুধু ভরে উঠছে। ভগবৎপ্রেমের, অনুরাগসিক্ত ভক্তির স্বাদ থেকে বঞ্চিত বলে সে জীবন আসলে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি ও ক্লান্তিকর একঘেয়েমিরই জীবন, যার প্রতিটি মুহূর্ত Whitman-এর ভাষায়, 'silent, secret loathing and despair'-এ অসহ্য হয়ে উঠছে। না, এজন্য প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার দরকার নেই। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' হয়ে অশন-বসনের ব্যবস্থা করতে ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে না এমন মানুষ মাত্রেই যেন আজ এই ক্লান্তি ও অবসাদের শিকার হয়ে জীবন-বিতৃষ্ণ হয়ে উঠছে। এক কথায় ভগবানকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দেওয়ার ফলে আধুনিক মানুষ কেমন যেন প্রাণহীন। সন্তোষ ঘোষের ভাষায় 'সে শুধু clinically জ্যান্ত আর সর্ব প্রকারেই মৃত!' ভালবাসার প্রাণরসের উৎসটি সাংসারিকতা ও অহংসর্বস্বতার পাথরে চাপা পড়লে জীবনতরু ক্রমশঃ শুকিয়ে তো যাবেই, যতই 'সার' তার গোড়ায় ঢালা হোক না কেন সবই তো 'অসার' হয়ে যাবে। এটি বুঝতেই হবে।

'Man is trapped within himself!' মানুষ আজ আপন জালে আপনি বদ্ধ হয়েই ভুগছে।

"তোমায় দূরে সরিয়ে মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো, সেই
ভূতের রাজত্বে!"

এটা যখন সে বোধ করবে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে, তখন নিশ্চয়ই তার 'হারানো বন্ধুটিকে' ফিরে পাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হবে যে তাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাবে। তাঁকে ফিরে পেলে এখনকার ভয়ংকর শূন্যের প্রাচুর্যই তখন পূর্ণের প্রাচুর্য হয়ে ঝল্‌মল করে উঠবে। শূন্যের আগে এক—সেই 'পরম এক' আসায় শূন্য, দশ, একশ, হাজার হয়ে যাবে। 'একলাভে সব লাভ,' বুঝলে ভক্তি-অমৃত লাভের জন্য আকুল হয়ে তাঁর দুয়ারে উপস্থিত হব, এবং হৃদয়ের আর্তি জানিয়ে তাঁকে বলব, বলবই বলব—

"আর্তজনের তুমি আশ্রয়,
স্থির নিশ্চয় জেনেছি আমি।
হে জগন্নাথ! কৃপা করে হও
আমার নয়নপথগামী।"

অযোগ্য বলে, ঠাকুর, দেখা যদি নিতান্ত নাও দাও, দেখা না পাওয়ার যন্ত্রণাটা অন্তত দাও। অন্তত এ যেন বুঝি, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে তোমাকে না পেলে চলবে না কিছুতেই,—তোমাকে না পেলে বাঁচব না।

ধ্যানের বস্তুকে প্রাণের বস্তু করো

পরমপুরুষের কথা যথার্থ ধারণা হলে—ঠিক ঠিক মনে বসে গেলে, মন তখন তন্ময় হয়ে যায় এবং ধ্যানের বস্তু প্রাণের বস্তুতে পরিণত হয়ে সমগ্র সত্তায় তার উপলব্ধি হয়। এইজন্যই ঠাকুর 'কথামৃতে' বার বার 'ধারণার' কথা বলেছেন। এই ধারণা করাটাই আসল। ধারণা না হলে শুধু পড়ে বা শুনে গেলে মনের ভেতরে ঢোকে না, সেখানে দাগ কাটে না। দাগ কাটলেই 'ভ্রান্তিরূপ' দূর হয়ে, মনে সর্বব্যাপী 'মাতৃরূপ' উদ্ভাসিত হয়। তখন কী মজা!! মনীষী টলস্টয়ের মহৎ উপন্যাস 'War & Peace'-এর প্রধান চরিত্র Bazuka হঠাৎ উপলব্ধি করছে যে পৃথিবীতে কোন ভয়

নেই, দুঃখ নেই, বন্ধন নেই—কেননা পরম আনন্দময় জগৎ আলো করে রয়েছেন, সর্বত্রই সে আনন্দালোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সর্বত্র তাঁরই আনন্দলীলা চলছে। আর তখন বেদের 'মধুমতী সুক্তের' ভাষায় মন গেয়ে ওঠে—

"মধুমান অস্তু সূর্যঃ······মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।"—আকাশের সূর্য থেকে পৃথিবীর ধূলি সবই মধুময়। ওঁ মধু। ওঁ মধু। ওঁ মধু।

জয় মা! জয় মা! জয় ঠাকুর!

আমিত্বের দায়

অমাবস্যার মহানিশায় যখন সব সুপ্তির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়, তখন সাধক জেগে বসে মায়ের পূজা করেন মহাশ্মশানে, যেখানে চিতাগ্নির লেলিহান শিখার আহুতি হতে হয় সকলকে। এই সমগ্র বিশ্বটাই মহামরণের একটা সুপ্রকট চিত্রমাত্র। জন্ম থেকে বিশ্বের প্রতিটি অনুপরমাণু মৃত্যুর বিজয়-পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছে। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর করাল কবলে প্রবেশ করতে উদ্যত বলেই তো প্রবেশার্থক 'বিশ' ধাতু থেকে 'বিশ্ব' শব্দটি নিষ্পন্ন।

মায়ের মরণলীলা অভিনয় তো আমিত্বের অসুরটিকে সংহার করে আমাদের আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে খণ্ড মিথ্যা বহুত্বকে বিলীন করে অখণ্ড এক পরম সত্যকে উদ্ভাসিত করার জন্য। তাই তো মার 'সর্বনাশী' রূপ। 'সর্বের' উপদ্রবেই না আমরা জর্জরিত, অস্থির। বিষয়ের পেছনে ছুটে খালি নিজেকে হারাচ্ছি, ভাবলে দুঃখ হয়। বিষয় 'আমাকে' দুর্লভ করে দিচ্ছে, তাকে খুঁজে পাওয়া বিষয়ের বোঝার ভেতর থেকে এক দুর্ঘট ব্যাপার। এই আমিত্বের দায় বয়ে, এই অহংকর্তৃত্ব ঘাড়ে নিয়ে যতই চলছি, বোঝা বেড়ে যাচ্ছে, পরিশ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি আর বুক থেকে বেরিয়ে আসছে হতাশা ও অবসাদের দীর্ঘশ্বাস—এ হয়রানি সবই তো শুধু জীবত্বের ভ্রমের দরুণ।

আমার বুকের ভেতরে, অহংবোধের মূলে তো রয়েছেন মা চিন্ময়ী। কিন্তু অহং-এর আকাশচুম্বি প্রাচীর তুলে বসে আছি যে, সুখের বন্যা পাছে আমায় ভাসিয়ে দেয়।

তাই করুণাময়ী সেটিকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজেকে প্রকটিতা করে মোহের অন্ধকার থেকে আত্মবোধের আলোয় আমাদের নিয়ে যেতে চান। তাই তাঁর এই ধ্বংসলীলার সংহারমূর্তি অহংবোধের বিনাশেই ভগবৎকর্তৃত্ববোধের প্রতিষ্ঠা। ভূমা সুখ; অসীম, শাশ্বত, পূর্ণরসময় ও অবাধ,—ওর লহর চলছে অনন্ত থেকে অনন্তে। Lockgate খুলে বসে থাক—সে অমৃতস্রোত খানিকটাও ঢুকলে জীবন-মরুভূমি নন্দন-কানন হয়ে উঠবে। পরম সুখ যাকে বলে মা-ভগবতীর ভাণ্ডারের ধন সেটি, আমাদের সযত্ন পরিপুষ্ট অহং ঢিপি সেটিকে আড়াল করে রয়েছে, চোখের জলে সেই স্তূপকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মায়ের ছেলে হয়ে আমরা মাতৃধনে একেবারে আণ্ডিল হতে পারি। তাই তো যুগাবতার এই অহং-সর্বস্ব যুগের মানুষের কানে 'নাহং, নাহং! তুঁহু, তুঁহু!' এই মন্ত্র দিয়েছেন। এ মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনা গুঞ্জরিত অনুরণিত হোক, আমাদের সমগ্র সত্তা মাতৃময় হয়ে উঠুক!

পূর্ণতা লাভের ব্রত

আমাদের জীবনটা পরম প্রেমময়ের কী প্রেমোজ্জ্বল উপহার! কত না আক্ষেপের কথা, একে আমরা যোগ্য মর্যাদা না দিয়ে লঘু করে ফেলছি; যথেচ্ছ ব্যবহারে এই রত্নোপহার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের হৃদয়, মন, বুদ্ধি; ভাব আবেগ, উদ্যম-চিন্তা সব যে প্রতিদিন সংসারের হাটে জলের দরে বিকিয়ে যাচ্ছে, জীবনের হীরের বাজারে 'হীরে' কিনতে এসে মুদির 'জিরে' নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাদের।

এর প্রতিরোধ করার একমাত্র উপায়, আমরা নিজেরা আসলে যা' তাই সজ্ঞানভাবে, সরলভাবে, সচলভাবে ও সম্পূর্ণভাবে হয়ে ওঠা। জীবনকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তার অনুশীলন করতে হবে একটা ব্রত বুদ্ধি

নিয়ে। জীবনভোর চলবে এক মহাপবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন, পূর্ণতালাভের ব্রত। কবি Browningএর অপূর্ব ছত্রটি এ ব্রত উদ্‌যাপনের প্রতিক্ষণে আমাদের মনে অনুরণিত হয়ে জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে দিক—

"Man only partly is ;
But wholly hopes to be !" (Browning)

সাধনা—বিরাট আমির সন্ধান

জীবভাবে যে 'আমি'র প্রকাশ তা' মহামায়ার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। চণ্ডী সেইজন্য বলছেন—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেন সংস্থিতা।"

'মা' আমার 'আমি-স্বরূপা', 'আমি-ময়ী'। যে বিরাট আমি-সমুদ্র থেকে এই অসংখ্য খুদে 'আমি-বুদ্‌বুদ' ফুটে উঠছে, সেই বিরাট আমির—"মহামায়ার" সন্ধান করার নামই সাধনা, সেই আমিকে ভালবাসার নামই ভক্তি, সেই আমিকে জানার নামই জ্ঞান।

"যশ্চ কিঞ্চিৎক্কচিৎ বস্তু সদসৎবাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিং সা ত্বং, কিংস্তূয়সে তদা ?"
[চণ্ডী ১ম ভাগ—ব্রহ্মাকৃত মহামায়ার স্তব]

কৃপা অহেতুকি

কৃপার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা' অকৃপণ। তাঁর নামই যে 'বিশ্বম্ভর,' প্রেমে বিশ্ব ভরবেন বলেই তো তাঁর ঐ নাম! নির্বিশেষে সকলকে দেব, এই তিনি জানেন, 'দেব না'—এ কোনদিন জানেন না।

পথ কি কেউ হারায়? পথ পাবার জন্যই বিপথের এত ভোগ—হয়রানির পাল্লায় পড়া। অন্তরের গুমরে ওঠা সে চাপা কান্না, তিনিই শুধু শুনতে পান! আর যে মুহূর্তে ডাক আন্তরিক হয়েছে, সেই মুহূর্তেই, যে ডেকেছে সে যতই অধম হোক, দুরাচার পাষণ্ড হোক, তিনি তার সব দুষ্কৃতি অপরাধ ক্ষমাই শুধু করেন না, তাকে বুকে তুলে নেওয়ার জন্য

নিজে এসে দাঁড়ান তার অশ্রুঝরা চোখের সামনে।

না, এ কবিত্বের ঝংকার নয়। কত ভেঙ্গে পড়া জীবনই না নবীন প্রাণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, উঠছে তাঁর করুণা স্পর্শে, রোমাঞ্চকর সে কাহিনীর শেষ নেই !!

কৃপার আলোয় 'আলো-ছায়া'

জেনো আছেন 'তিনি', 'এই তুমি' নেই। তুমি আলোর দিকে এগোলে, ছায়াটা পেছনে থাকে, আর বিপরীত দিকে পথটা তিমিরে ঢাকে। শেষটায় ছায়াবাজীর মায়ারাজি ছেড়ে যেতে হয় সেইদিকেই— যেখানে কোল পেতে তোমার প্রকৃত আশ্রয় জ্যোতির্ময়।

আলোর ছেলে তুমি - কেন পথ হারাবে আলোটাকে পেছনে ফেলে ? আহা, কী ভরসার কথা। যে 'অহং'-ভূত আমাদের সারাক্ষণ নাচাচ্ছে, ভয়-উদ্বেগ-অশান্তিতে আমাদের একেবারে নাজেহাল করে তুলছে, সেটি ছায়া-মূর্তি অপদেবতা মাত্র, ভয়ে সব তার পায়ে ঢেলে ঢেলেই তাকে বিকট দানব করে তুলেছি—'If ghosts drink blood, they become living presence.'

কিন্তু তাঁর কৃপার আলো এখন যে এসে পড়েছে, সব ভয় "জুজুর" ভয় ছাড়া কিছু নয় বুঝতে পেরেছি।

তবু এতদিনের ভয়—বুকের দুরদুরুনিটা একেবারে থেমে যেতে একটু সময় লাগবে বৈকি ? কিন্তু তাতে কি ? ভূতে ধরার বিপদ তো আর নেই। ওসব একেবারে শেষ হয়ে তাঁর আশ্রয় লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে এখন ভরপুর হতে চলেছি। মাতৃ-আলোর যে প্রকাশ হয়েছে তাতেই সব ছায়া মিলিয়ে যাবে, এই ভরসায় নিশ্চিন্তবোধ করছি।

"ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে—
চেয়ে দেখ্ দেখ্ ঊর্ধ্ব শিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ময়।
ওরে, আর নাহি ভয় !"

"এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
নিমেষেই প্রভাত-আলোকে, পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
থেমে যাবে সকল কল্লোল।

কোথায় তুমি?

আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ একটি কথা, কিন্তু একটু ভাবলেই ধরা পড়ে কথাটি গভীর তাৎপর্যময় অসাধারণ কথা, বোধ হয় একেবারে পরম বাক্য। ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত কথাটি মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে, যেন বলতে চাচ্ছে এটি মনে গেঁথে নেওয়া চাই।

মাস্টারমশায় সবে কিছুদিন আসছেন। ঠাকুরের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন, অমিয়কণ্ঠের যে সঙ্গীতলহরী আরো শোনার বড় সাধ। ঠাকুর সস্নেহে বলছেন, "কাল বলরামের বাড়ীতে যাব, তুমি এস।" অচেনা সেখানকার সবাই, তাঁর সন্নিধানে সেখানে উপস্থিত হওয়া মুশকিল হতে পারে শ্রীম জানালে, ঠাকুর অমনি বললেন—"তা কেন? আমার নাম করবে, বলবে তাঁর কাছে যেতে চাই। তাহলেই কেউ না কেউ এসে তোমায় আমার কাছে নিয়ে যাবে।"

হায়! এই অচেনার রাজ্যে আমার বড় চেনা সেই মানুষটি তো রয়েছেন। তাঁর নাম করলেই, তাঁর কাছে যেতে চাইলেই, তাঁর কাছে ঠিক এসে যাব। মাকে ভিড়ের মধ্যে—সংসারের ভিড়-বিভ্রান্তির ভেতর হারিয়ে যে শিশু মা, মা করে কেঁদে অস্থির হচ্ছে তাকে কেউ না কেউ কোলে করে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। দরকার হারানো ছেলের কান্নাভরা 'মা-মা' ডাক।

মহামনীষী রাধাকৃষ্ণণ বড় সুন্দর বলেছেন,

> "The ability to feel lost, is man's tragic destiny and glorious privilege. Man's anguish is the hope for salvation."

আপনহারার আর্তি

"তোমার গোপন প্রাণের একলা মানুষ যে,
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে।
তার একলা ঘরের ধেয়ান হতে
উঠুক না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন মাঝে, তারে থাকতে দে।"

মানুষের যত দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে তাকে বাইরে খুঁজতে গিয়ে বিষয়-ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতে গিয়ে আপনাকেই পর করে ফেলে মানুষ আজ বাইরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লান্ত। 'আপন-হারা' মানুষটির প্রাণে এই ব্যথাই গুমরে উঠছে—

"আমার আপন জনে জানা হোলো না !!"

মানুষের দেবতাই মানুষের এই মনের মানুষ। কামনা বাসনায় নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে দৃষ্টির বিকার ঘটেছে বলেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই না।

চলো বনে যাই—গহন বনে একাকী যাই, কারও টান বুকে না গেঁথে, নির্ভয়ে নিঃসংশয়ে পরমানন্দে যাই। সে বন বাইরের বন নয়, অজস্র দ্বন্দ্বময় মায়িক সংসারের শত সহস্র বিক্ষেপ থেকে সুদূর ভগবানকে লাভ করার ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় আকুল বৈরাগ্যদীপ্ত হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা রূপ বন। সংসারের সমস্ত কোলাহল বাইরে থাকুক: অন্তরের সেই একাত্মতায় আর কেউ নেই, শুধু চিন্ময়ী মা, আমার অন্তরতম।

"মন তুই দেখ আর আমি দেখি—
আর যেন কেহ নাহি দেখে।"

জয় মা, জয় মা,
জয় করুণাময়ী মা।



স্নেহভাজনদের প্রতি আশীর্বাণী

তোমরা যারা প্রসন্ন মানের অর্ঘ্য আমাকে দিতে পেরেছ তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি অন্তরতম শান্তি ও সার্থকতা তোমাদের জীবনকে পূর্ণ করুক। তোমাদের কাছ থেকে অযাচিত অর্ঘ্য পেয়েছি। হৃদয়ের অকৃত্রিম অর্ঘ্য দুর্লভ দান। এই অন্তরের দানকে মন বাইরে রূপ দিতে চায়, তাই কিনা উপহার তোমাদের কাছে পেয়েছি এবং কাজকর্ম ভুলে আজকের দিনটি উৎসবের দিন করে তুলতে তোমরা এত উৎসাহিত হয়েছ। এসবের মাধুর্যে আনন্দিত হই, অভিভূত হই। আর কদিনই বা বাঁচব ? যাদের কাছ থেকে এত শ্রদ্ধা পেয়েছি, এত ভালবাসা পেয়েছি, এত মমতা পেয়েছি, তাদের নিয়েই বাকী দিনগুলি আনন্দে কাটাতে চাই। আমার জীবনের পরিধি ছোট, শক্তিও অল্প, তাই সেখানেই ভাব ও চিন্তার বীজ বোনা চাই যেখান থেকে তার দাবী আসে, আর যেখানে একদিন তার ফসল ফলবে। তোমরা আমাকে চাও, আর প্রকাশও করো যে আমাকে তোমাদের প্রয়োজন। তাই তোমাদের সংস্পর্শে এসে আমি নিজেকে মেলে ধরতে পারি।

তোমাদের কথা যতই মনে করি মন উৎফুল্ল হয়। কয়েকটি জীবনে যে ঠাকুরের কৃপায় একটু কাজে এসেছি এটা আমার বিদায়-গোধূলির মুহূর্তগুলিকে যে কী তৃপ্তিময় করে দেয়, বলবার নয়। মনে রেখ, তোমাদের স্নেহ করেছি, তোমাদের ওপর আমার গভীর আস্থা আছে বলেই তোমাদের এত কথা বলি, বলা শেষ হতে চায় না—এবং তোমরাও কত আগ্রহেই না তা শোনো। এই আগ্রহ আমাকে উৎসাহ দেয়, সৃষ্টিশীল করে তোলে নিঃশেষ শক্তি এ বিদায়ী নটকে, আমার জীবন সায়াহ্নে যেন প্রত্যূষের আলো এসে পড়ে। কবির ভাষায়,—

> "জল নেমে যাওয়া ভাঁটার কাদার পরে,
> গান যে জাগায় জলকল্লোল স্বরে।"

এক কথায় তোমরা আমাকে 'আপন' করতে পেরেছ, আমার মত একজন মানুষকে। আর আমিও তোমাদের পেয়েছি একেবারে আপনরূপে। যেখানে "কেউ কারো নয়" এবং সেইজন্যই "মিছে" হয়ে পড়ে জীবনযাত্রারূপ "এই ভূমণ্ডলে" ঘোরাঘুরি, সেখানে এরূপ হওয়া কী অভাবনীয় ইন্দ্রজাল।

তোমরা যারা তথাকথিত 'পর' তারা যখন কাছে আসে, এত অকারণ অহেতুক

শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আনো যে হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়, বুঝতে পারি না কেন পাই ? সত্যি ও অমূল্য, এ দুর্লভ! শরৎবাবুর "পণ্ডিতমহাশয়ের" ভাষায় বলতে হয় "এ ধরনের ভালবাসা ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত পাওয়াও যায় না, দেওয়াও যায় না!"

তাই নিয়ত স্মরণ করি তাঁকে, যিনি আমাদের "সিঁথি পরিবার"টি গড়ে তুলে তাঁর অলৌকিক স্নেহের আবেষ্টনীর মধ্যে আমাদের টেনে নিতে চাইছেন। আমাদের হৃদয়ের সাড়া দিয়ে তাকে যেন সার্থক করতে চাই। কারণ নতুন চলার পথ, এর দ্বারা আমরা পাব—যে পথে পায়ে চলা যায় না, চলতে হয় সুরের টানে—মাতৃকণ্ঠের মধুর স্বর শুনে 'ঘরের নেশা' ধরে যে পথে ছিটকে পড়ে। মা শুধু আমার পথের গন্তব্য তো নন, পথটিও যে মা'. সিঁথির কুটিরের দুয়ারের ওপরেই মা রয়েছেন, তার মানে এ দুয়ার দিয়ে ঠিক ঠিক ঢুকলে, মাতৃপথে মাতৃসদনে উপস্থিত হওয়া যায়। তাই কুটিরটি যেন মন কেড়ে নেয়, ঘুরে ফিরে খালি আসতে ইচ্ছা করে এখানে, 'মমত্ব' এসে যায় এর ওপর। হবেই তো! এই ছোট্ট গোষ্ঠীটিই যে তাঁর মমতার সৃষ্টি, যথার্থ এখানকার যারা তারা এখানে একত্র হয়ে আনন্দিত হয়, তাই তাদের কাছে এ জায়গাটির বিশেষ একটা আকর্ষণ আছে এবং সে আকর্ষণ ক্রমবর্ধমান।

এখানকার ঠাকুর-মা কত ভক্তি, অনুরাগ ভালোবাসা মাখানো, ব্যাকুলতার কত অশ্রুজলে স্নান করানো, ঠাকুরমায়ের কত প্রার্থনায় জাগ্রত। এখানে মন তাঁদের জাগ্রত সান্নিধ্যের অমৃতস্পর্শ পেয়ে ভারী একটা তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা বোধ করে।

"জননীং সারদাম্ দেবীম্
রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুং।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা
প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

—লেখক

"মৃণাল কুটির"
সিঁথি